উপনিবেশ

দ্বিতীয় পর্ব

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ··· কলিকাতা - ৬

প্রকাশকাল : মাঘ—১৩৫৭

জটিল অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপনা যাঁর
পেশা, দুরূহ রাজনীতি যাঁর নেশা এবং
পরম সাহিত্যরসগ্রাহী যাঁর মন, সেই

সুহৃদবর বীরেন্দ্রলাল লাহিড়ীকে—

উপনিবেশ

দ্বিতীয় পর্ব

বিভ্রান্ত বসন্ত

১

মানুষই কি কেবল রচনা করে ইতিহাসকে? ইতিহাস মানুষকে রচনা করে না কোনোদিন?

ষোড়শ-সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী। দুশো বছর ধরিয়া পর্তুগীজেরা কী না করিয়াছে ভারতবর্ষের উপরে। ঝড়ের রাত্রে বাসুকীর ফণার মতো নীল সমুদ্র যখন দুলিয়া দুলিয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে, বোম্বেটে জাহাজের পালগুলি তখন ঝড়ের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ডানার মতো তাহারি উপর দিয়া উড়িয়া গেছে। অন্ধকার—স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল হইতে অন্ধকার ঠেলিয়া উঠিতেছে, সমুদ্র আর্তনাদ করিতেছে পিঁজরায় বাঁধা বন্য-জন্তুর মতো। আর সেই সমুদ্র আছড়াইয়া পড়িতেছে পৌরাণিক যুগের অতিকায় দৈত্যের মতো গ্র্যাণাইট পাথরের খাড়া পাহাড়ের গায়ে। মৃত্যুর প্রতীক কালো অ্যালবাট্রসের কান্না ছাপাইয়া উঠিতেছে সমুদ্রের মত্ত হুংকারকে।

আর তাহারই নীচে এই ঝড়ের মধ্যেও অনেকগুলি আলো মিট্ মিট্ করিতেছে—সুরাটের—বন্দর। অকস্মাৎ মশালের আলো—আর্তনাদ—

বন্দুকের শব্দ। পর্তুগীজেরা বন্দর লুঠ করিতেছে। অন্ধকারের পর্দা ছিঁড়িয়া ছবির মতো দেখা দেয় আর একটি দৃশ্য। বঙ্গোপসাগর। সপ্তগ্রামের বণিকদের বহর চলিয়াছে সিংহলে বাণিজ্য করিতে। হার্মাদের জাহাজ হইতে কামান গর্জন করিয়া উঠিল। সকালের আলোয় উদ্ভাসিত নির্মল নীল সমুদ্র লাল হইয়া গেল মানুষের রক্তে······

সময়ের চাকা ঘুরিয়া চলে অবিশ্রান্ত। স্বার্থে স্বার্থে দ্বন্দ্ব চলে। ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, দিনেমার। নবাবের রত্নসিংহাসন চূর্ণ হইয়া ধুলায় লুটাইয়া পড়ে। বণিকের মানদণ্ড দেখা দেয় রাজদণ্ড হইয়া। পলাশীর জনশূন্য প্রান্তরে, ঘন নিবিড় আমের বনের বিষণ্ণ ছায়ায়, গঙ্গার পরপারে যখন মলিন সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসে, তখন সমুদ্রের ওপারের সাম্রাজ্যবাদের নতুন সূর্য দেখা দেয়।

ভাস্কো-ডা-গামার জাতি। ভারতবর্ষকে প্রথম যাহারা অপরিচিত প্রাচীর নির্ণিরীক্ষ্য অন্ধকার হইতে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিল, আজ ভারতবর্ষের কয়েক ইঞ্চি জমিতে তাহাদের অধিকার আছে মাত্র। তাহাদের দিগ্বিজয়ী নৌবহর আজ ইতিহাসের পাতা আশ্রয় নিয়া আত্মগোপন করিয়াছে, ইংরেজের ম্যান্‌-অফ্‌-ওয়ারের সামনে আসিয়া দাঁড়াইবে এমন সাধ্য কি! চক্রবর্তী ইংরেজের ছত্রছায়ায় আশ্রয় লইয়া সেই দুর্ধর্ষ হার্মাদেরা আজ পায়জামা গুটাইয়া জমিতে লাঙল ঠেলিতেছে, বিড়ি টানিতেছে, ম্যালেরিয়ার আক্রমণে চোখ-মুখ বুজিয়া কুইনাইন গিলিয়া চলিয়াছে।

ইতিহাস রচনা করিয়াছে মানুষকে। ঘুমের দেশ এই ভারতবর্ষ। কোথায় ককেসাস পাহাড়ের তলা হইতে প্রথম আসিয়াছিল যাযাবর মানুষের দল। দর্শন, বিজ্ঞান, কাব্যের মধ্যে তাহাদের সমস্ত পশুশৌর্য

গেল তলাইয়া। শক আসিল, হুণ আসিল, গ্রীক্ আসিল, মুসলমান আসিল—কুম্ভকর্ণের মাটিতে পা দিয়া তিনদিনের বেশি কেউ তাহাদের জাগিয়া থাকিতে পারিল না। পর্তুগীজেরাই বা সে নিয়মের ব্যতিক্রম করিবে কি করিয়া? বর্তমানের সূর্যও তো একদিন অস্তে নামিবে, সেদিন ইতিহাসের এই ক্ষুধা যে তাহাকেও গ্রাস করিবে না—এমন ভবিষ্যদ্বাণী আজ কে করিতে পারে?

* * * * *

সিবাষ্টিয়ান গঞ্জালেসের বংশধর স্যামুয়েল গঞ্জালেস্। শুঁটকী মাছের ব্যবসা করে সে। সন্দীপ হইতে ষ্টিমারে করিয়া সে চট্টগ্রামে ফিরিতেছিল। বাংলা দেশের একেবারে তলার দিকে নদী আর সমুদ্র একাকার হইয়া আছে একেবারে—শাদা আর নীলের একটা বিচিত্র সৌন্দর্য। বহুদূরে বাতাসে সবুজ বন মাথা নাড়িতেছে—জলের প্রান্ত-রেখার সঙ্গে একেবারে মিলিয়া গেছে বিচিত্রভাবে। মাথার উপর দিয়া পাখী উড়িয়া চলিয়াছে—ষ্টিমারের চোঙ্গা হইতে ধোঁয়া উড়িতেছে, আর জলের উপর তাহার ছায়া কাঁপিতেছে আঁকাবাঁকা ছবির মতো।

রেলিং ধরিয়া গঞ্জালেস্ দাঁড়াইয়াছিল। সামনে পিছনে নৌকা নাচিতেছে, ওপারে তীরের গায়ে ষ্টিমারের ঢেউ যে একরাশ ফেনা লইয়া আছড়াইয়া পড়িতেছে, এতদূর হইতেও সেটা বেশ বুঝিতে পারা যায়। নদীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া নানা রকমের অর্থহীন অলস ভাবনা তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে পাক খাইয়া চলিয়াছিল। ভাবনার সুর কাটিয়া দিল এমন সময় ডি-সুজা আসিয়া।

সে-ও এই ষ্টিমারের যাত্রী। অনেকক্ষণ হইতে কৌতূহলী চোখ মেলিয়া স্যামুয়েলকে লক্ষ্য করিতেছিল সে—মানুষে মানুষে এত সাদৃশ্যও

সম্ভব! যেন ডেভিড গঞ্জালেস্ এতদিন পরে যৌবন লইয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখা দিল।

—কোথায় যাওয়া হবে?

প্রশ্ন শুনিয়া গঞ্জালেস্ বিরক্ত হইয়া তাকাইল, কিন্তু স্বজাতি। কহিল, চিটাগাং। তুমি কোথায় যাবে?

ডি-সুজা দন্তহীন মুখে হাসিল, একই পথের পথিক। তুমি বুঝি ওখানেই থাকো? কী করো?

—মাছের ব্যবসা।

মেরীর নাম করিয়া ডি-সুজা শপথ করিল একটা।

—চিনেছি তোমাকে। তুমি স্যামুয়েল গঞ্জালেস্ তো?

স্বীকার করিয়া স্যামুয়েল বিস্মিত চোখে তাকাইয়া রহিল।

—তোমার বাপের সঙ্গে আমার খাতির ছিল খুব। একসঙ্গে দুজনে গোয়াতে হোটেল খুলেছিলুম, তার পর সেখান থেকে ম্যাড্রাসে। কিন্তু বেশিদিন চলল না—পুলিশ পিছে লাগল কি না।

বাচন-ভঙ্গির অন্তরঙ্গতায় উত্তরোত্তর বিস্ময় বোধ করিতেছিল গঞ্জালেস্। কিন্তু পিতৃবন্ধু, সুতরাং সবিনয়ে প্রশ্ন করিল, হোটেল খুললে কিন্তু তাতে পুলিশ পেছন লাগল কেন?

—বাঃ, লাগবে না? মদের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু লাইসেন্স তো ছিল না। পুলিশ অবশ্য সবই জানত, ভাগ-বাঁটোয়ারাও ছিল—কিন্তু ওই টাকাপয়সার ব্যাপারেই শেষ পর্যন্ত আর বনল না। ব্যাটাদের পেট তো আর সহজে ভরাবার নয়। কাজেই—বাকীটা যে সম্পূর্ণ বলা বাহুল্য, এমনি একটা ভাব দেখাইয়া খানিকটা দন্ত-বিকাশ করিল সে।

গঞ্জালেসের লোকটাকে নেহাৎ মন্দ লাগিল না। মুখের দিকে

চাহিলেই বোঝা যায়, খালি বাতাসেই তাহার বয়স বাড়ে নাই ; বহু ঝড় পাড়ি-দিয়া-আসা নৌকার ছেঁড়া পাল আর ভাঙা-দাঁড়ের সঙ্গে কোথায় কী যেন সামঞ্জস্য আছে তাহার। সর্বাঙ্গে যুদ্ধের চিহ্ন। নিরুত্তাপ নিস্তেজ জীবনে দুঃসাহসী যে পর্তুগীজের রক্ত গঞ্জালেসের ধমনীতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, ডি-সুজার মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকাইয়াই সে রক্তে যেন দোলা লাগিয়া গেল। আর তা ছাড়া পিতৃবন্ধু। নিজের বাপকে অবশ্য সে খুব ভালো করিয়া মনে করিতে পারে না, মনে করিবার মতো কোনো স্মৃতি কখনো সে রাখিয়াও যায় নাই। অতি শিশুকালে গঞ্জালেস্ দু-একবার দেখিয়াছে লোকটাকে। কোথায় কোথায় থাকিত কী যে করিত, কেউ বলিতে পারিত না। গঞ্জালেসের মা এক মিশনারীর বাড়িতে রাঁধুনিগিরি করিত, সেই অন্নেই বহু দুঃখে তাহারা মানুষ। বাপের মাঝে মাঝে দেখা পাইত—তবে তাহার আবির্ভাব ঘটিত মূর্তিমান একটা দুর্যোগ বা দুঃস্বপ্নের মতো। এক মুখ দাড়ি, ছেঁড়া পায়জামা, মুখে অশ্রাব্য শপথ এবং কদর্য গালাগালি। যে কয়েকটা দিন থাকিত তাহাদের মাকে ধরিয়া বেধড়ক প্রহার করিত, শিশুদের ধরিয়া আছাড় মারিয়া ফেলিয়া দিত। আর সমস্ত দিন মদ গিলিত অশ্রান্তভাবে। যেন তাহার পেটের মধ্যে সাহারা মরুভূমির মতো কী একটা বিরাট ব্যাপার রহিয়াছে ; পৃথিবীতে যত মদ আছে, একটানে চোঁ চোঁ করিয়া শুষিয়া লইতে পারে।

এই তো বাপের সম্পর্কে তাহার স্মৃতি। শুধু এইটুকুই অবশ্য নয়, চুলের তলায় অনেকখানি কাটা চিহ্নও পিতারই সস্নেহ অবদান। তবু বড় হইয়া গঞ্জালেস্ তাহাকে শ্রদ্ধা করিয়াছে। দুঃসাহস ছিল তাহার রক্তে, ছিল বিদ্রোহ। সব ভাঙিয়া চুরিয়া বেপরোয়া ছন্দে জীবনটা

বহিয়া গেছে তাহার, প্রয়োজনের গণ্ডীতে নিজের দুর্দান্ত মনটাকে সে মারিয়া ফেলে নাই। ইংরেজের আইন তাহাকে ধরিবার বহু চেষ্টা করিয়াছে, পারে নাই—ছুঁইয়া গেছে মাত্র। নবাব আলীবর্দী খাঁর কামানের পালটা জবাব দিয়াছিল সিবাষ্টিয়ান গঞ্জালেসের দুরন্ত বাহিনী। ডেভিডের কানের পাশ দিয়া চলিয়া গেছে পুলিশের রাইফেলের গুলি, কিন্তু তাহার পিস্তলের লক্ষ্য ব্যর্থ হয় নাই।

আর গঞ্জালেসের মুখের দিকে চাহিয়া ডি-সুজাও এমনি কিছু একটাই ভাবিতেছিল বোধ হয়। সন্ধ্যা আসিতেছে। নদীর খাদ-মিশানো সমুদ্রের জল ধূসর হইয়া আসিতেছে। তাহারি উপর ঝল্‌মল্ করিতেছে দিনান্তের লাল আলো। দূরের সবুজ বনরেখা সে আলোয় রঙীন হইয়া উঠিয়াছে—সমুদ্রের শাড়ীতে কেউ যেন জরীর পাড় বসাইয়া দিয়াছে। আর সেই আলো জ্বলিতেছে গঞ্জালেসের বড় বড় দুটি পিদল চোখের ওপর—একটা উগ্র দীপ্তি তাহা হইতে ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছে যেন। সুগঠিত দীর্ঘ দেহ—সেদিকে চাহিলেই তাহার বাপকে মনে পড়িয়া যায়। আম্বালা ষ্টেশনের সেই শিখ ষ্টেশন মাষ্টারটা। গঞ্জালেসের সেই ঘাতক-মূর্তিটা ডি-সুজা আজো ভুলিতে পারে নাই। গঞ্জালেস্‌ই তো তাহার মাথায় ঠাসিয়া কুড়ালের কোপ বসাইয়া দিয়াছিল—আর সেই সুযোগে সে ভাঙিয়া নিয়াছিল অফিসের ক্যাশবাক্স। কুড়ালের শাদা পুরু ফলাটা রক্তে রাঙা—সেই সঙ্গে বিচূর্ণ মস্তিষ্কের খানিকটা ঘিলু ছিটকাইয়া আসিয়া কপালে লাগিয়াছে গঞ্জালেসের। পকেট হইতে একটা রুমাল বাহির করিয়া সেগুলি মুছিতে মুছিতে কী একটা রসিকতা করিয়াছিল সে।

হাসিলে কী উজ্জ্বল যে দেখাইত ডেভিডের দাঁতগুলি।

স্যামুয়েলের দিকে চাহিয়া চাহিয়া আজ আবার তাহার বাপকে মনে পড়িল। সেই প্রশস্ত কপাল, সেই তীক্ষ্ণ উদ্ধত চোয়াল, ভুল হইবার কারণ নাই কোনোখানে। কেবল মুখে সে বিদ্রোহ নাই—আছে শান্ত খানিকটা দুর্বলতা মাত্র।

কয়েক মিনিট দুজনেই দুজনের দিকে চাহিয়া রহিল নীরবে। পায়ের নীচে এঞ্জিনের ছন্দে ছন্দে কাঠের মেজেটা দ্রুত লয়ে কাঁপিতেছে, প্যাডেলের ঘায়ে জলের হু হু শব্দ। মাঝে মাঝে শাদা ফেনা বিকালের রোদে জাপানী বলের মতো রঙীন হইয়া ছিট্‌কাইয়া উঠিতেছিল আকাশের দিকে।

প্রশ্নটা গঞ্জালেস্‌ই করিল প্রথমে।

—চিটাগাংয়ে কেন চলেছ তুমি ?

ডি-সুজা বকের পাখার মতো শাদা ভুরু দুইটাকে দুই দিকে প্রসারিত করিয়া একটু হাসিল মাত্র—জবাব দিল না।

—ব্যবসা-ট্যাবসা আছে বুঝি ?

—ব্যবসা ? সতর্কভাবে ডি সুজা চারিদিকে তাকাইল একবার। ডেকের এদিকটা একেবারে নির্জন—একটু দূরে কতকগুলি মুসলমান চিঁড়া আর আম লইয়া অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে ফলারে বসিয়াছে। নীচে প্যাডেলের আঘাতে বিচূর্ণ বিক্ষুব্ধ জল হইতে একটানা গর্জন উঠিতেছে। এঞ্জিনের যান্ত্রিক শব্দ বাজিতেছে ক্রমাগত এবং বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ তাহাদের চারিদিকে একটা ধ্বনির যবনিকা টাঙাইয়া দিয়াছে।

—ব্যবসা ? দন্তহীন মুখে হাসিটাকে প্রকটিত করিয়া ডি-সুজা বলিল, হাঁ, ব্যবসা আছে বটে। তবে সেটা নিতান্ত আইনসঙ্গত নয়—এই যা।

—তার মানে? গঞ্জালেস চমকিয়া উঠিল। ডি-সুজার সমস্ত অবয়ব ঘিরিয়া যে বিচিত্র রহস্যের আবরণ, সেটা একটু একটু সরিতেছে যেন।

—তুমি ডেভিডের ছেলে তো? তোমাকে বলতে ভয় নেই তা হলে। আফিং কোকেনের কিছু কারবার আছে, তবে ডিউটি দেবার হাঙ্গামাটা আর পোয়াই না। বুঝেছ তো?

—বুঝেছি। শান্ত নিরুত্তাপ রক্তে আবার দোলা লাগিল গঞ্জালেসের। ডি-সুজার বয়স হইয়াছে, চুলগুলিতে সাদার নিষ্কলঙ্ক আস্তর। চোখ দুটি ম্লান—কিন্তু বহু ঝড় পার-হইয়া-আসা নৌকার ছেঁড়া পাল আর ভাঙা দাঁড়ের মতো একটা নির্ভীক দৃঢ়তা তাহাকে ঘিরিয়া আছে।

—কোথায় গিয়ে উঠবে চিটাগাংয়ে?

ডি-সুজাকে চিন্তিত দেখাইল: তাই তো ভাবছি। আড্ডা যেটা ছিল সেটার ওপর ওদের নজর পড়েছে, কাজেই সেখানে ওঠা ঠিক হবে না। তা ছাড়া আধ মণ মাল আছে সঙ্গে—হোটেলে গিয়েও ওঠা যাবে না।

—আধ মণ!

—হাঁ, অন্তত এক হাজার টাকার জিনিস। তা ছাড়া ধরা পড়লে হেঁ—হেঁ—ডি-সুজা হাসিল: স্রেফ দশ বছর ঠুকে দেবে। তা এই বুড়ো বয়সে ওটা আর পারব না।

গঞ্জালেসের চোখে মুখে আন্তরিকতা প্রকাশ পাইল।

—কিছু যদি মনে না করো, আমার একটা আস্তানা আছে। সেখানে বেশ থাকতে পারা যাবে।

—মনে করব—বিলক্ষণ! আপ্যায়নের হাসি হাসিল ডি-সুজা:

তুমি ডেভিডের ছেলে! কিন্তু তোমার জায়গাটা, কি বলে, কোনো ভয়টয় নেই তো?

—না, কোনো ভয়টয় নেই—আশ্বাস দিল গঞ্জালেস্।

অতএব পথেই দুজনের অন্তরঙ্গতা অত্যন্ত প্রগাঢ় হইয়া উঠিল। আরো কয়েক ঘণ্টার পথ চট্টগ্রাম। ইহারই মধ্যে ডি-সুজা দিব্যি গল্প জমাইয়া লইল গঞ্জালেসের সঙ্গে। সে আর ডেভিড্ কী না করিয়াছে দুইজনে, পৃথিবীর কোন্ বৈচিত্র্য পরখ করিতে তাহারা বাকী রাখিয়াছে। তবে এখন আর সেদিন নাই। ইংরেজের আইন বড় বেশি কড়াকড়ি আরম্ভ করিয়াছে—তা ছাড়া সেই সব দিনের দুঃসাহসী মনই বা আজকাল কোথায়! বাংলা দেশে যে সব পর্তুগীজ উপনিবেশ বাঁধিয়া আছে, ডাকাতি রাহাজানির চাইতে তাহারা এখন জমিতে লাঙল ঠেলিতে ভালবাসে, সাহেবী রেঁস্তোরায় বাবুর্চি হইতে চায়। 'জেন্টুর'-দের সঙ্গে তাহারা এক পংক্তিতে নামিয়া বসিয়াছে—ইহার চাইতে অসম্মান ও অগৌরবের ব্যাপার সমগ্র পর্তুগীজ সমাজে আর কী হইতে পারে!

বলিতে বলিতে ডি-সুজা উদ্দীপ্ত হইয়া ওঠে, মুঠা করিয়া ধরে গঞ্জালেসের হাতটা। কব্জীর তলায় তামাটে চামড়ার নীচে তাহার ঠেলিয়া-ওঠা মোটা নীল শিরাগুলি রক্তের আন্দোলনে থর থর করিয়া কাঁপে, নিঃশ্বাস পড়িতে থাকে দ্রুত তালে।

সমস্ত শরীরের মধ্যে যেন বিদ্যুৎ বহিয়া যায় গঞ্জালেসের—যেন ডি-সুজার উত্তেজিত চাঞ্চল্যটা তাহার মধ্যেও সংক্রামিত হইতে শুরু করিয়াছে। বলে, ঠিক কথা।

—ঠিক কথা নয়? স্বপ্নাতুর হইয়া ওঠে ডি-সুজার চোখ: পর্তুগীজদের দিগ্বিজয়ী নৌবহর ইতিহাসের ছেঁড়া পাতাগুলি পার হইয়া আবার কি

আসিয়া দেখা দিতে পারে না? আগুন জ্বলিতেছে সপ্তগ্রামের বন্দরে। বন্দুকের শব্দে রাত্রির ভয়ার্ত হৃৎপিণ্ড কাঁপিয়া উঠিতেছে থর থর শব্দে। বিবাহ-বাসর হইতে সুন্দরী মেয়েদের ছিনাইয়া আনিয়া বজরার অন্ধকারে সেই রাক্ষস-বিবাহ। আলীবর্দীর কামানের গোলাগুলি লাল আগুনের পিণ্ডের মতো সমুদ্রে আসিয়া পড়িতেছে, কিন্তু হার্মাদের জাহাজকে তাহা স্পর্শও করিতেছে না।

শুধু কি তাই? বীররস হইতে ডি-সুজার মন মাঝে মাঝে বর্তমান পৃথিবীতেও ফিরিয়া আসে। ইহারই মাঝে মাঝে ডি-সুজা নিজের পরিবারের গল্পও বলে। লিসিকে সে অত্যন্ত ভালোবাসে—ওই মা-মরা নাত্‌নীটার জন্যই তাহার যা কিছু দুর্বলতা। ও না থাকিলে আবার হয় তো সমস্ত ভারতবর্ষটায় সে আর একবার অভিযান করিতে বাহির হইয়া পড়িত—কিন্তু লিসিকে ছাড়িয়াই থাকিতে পারে না। তাহার ঘর সংসার যাহা কিছু লিসিই আগলাইয়া রাখিয়াছে। নিজে ডি-সুজা সামান্য যা কিছু টাকা-পয়সা করিয়াছে তা ওই লিসির জন্যই ভালো দেখিয়া একটা ছেলে জোটাইতে পারিলে তবে নিশ্চিন্ত।

ডি-সুজাকে গঞ্জালেসের ভালো লাগিয়া গেল।

চট্টগ্রামে আসিয়া ডি-সুজা গঞ্জালেসের আতিথ্য লইল। শুধু আতিথ্যই লইল না—চর ইস্‌মাইল হইতে একটি বার ঘুরিয়া আসার সনির্বন্ধ অনুরোধও জানাইল তাহাকে। গঞ্জালেস্ রাজী হইল। তারপর একদিন চাঁদপুর হইতে নৌকায় পাড়ি দিয়া চর ইস্‌মাইলে আসিয়া দর্শন দিল।

প্রকৃতির একেবারে কোল ঘেঁষিয়া সদ্যোজাত [illegible] চর ইস্‌মাইল।

অবশ্য একেবারে সদ্যোজাতও নয়। ইতিহাসের দিক দিয়া খুঁজিতে গেলে গত তিনশো বছর ধরিয়া সমুদ্রচারী জলদস্যুদের সে সযত্নে আশ্রয় দিয়াছে —এককালে এখানে তাহাদের বিরাট উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছিল। সে উপনিবেশ অবশ্য নদীগর্ভে অনেকখানি লোপ পাইয়াছে, কিন্তু মাটির মধ্যে পুঁতিয়া যাওয়া মরিচা-পড়া কামান সেদিনের স্মৃতি বহিয়া আজও মুখ তুলিয়া আছে আকাশের দিকে।

তবু চর ইস্‌মাইল শিশু। শিশুর মতো অপরিণত—শিশুর মতো নিজেকে ভাঙিয়া চলে। চূর্ণ খেলনার ধূলি ভাঁটার টানে নামিয়া যায় বঙ্গোপসাগরে। দেহ আর মনের ক্ষুধা আদিম অমার্জিত রূপ লইয়া দেখা দেয়। অতীত নাই—কিন্তু বাতাসে বাতাসে তাহার নিশ্বাস এখনো ফুলের গন্ধের মতো ছড়াইয়া আছে।

এমনি একটা পটভূমিতে গঞ্জালেস্ দেখিল লিসিকে।

আরাকানী-খাদমিশানো তামাটে মুখে ছোট ছোট চোখ দুটিকে আরো ছোট করিয়া লিসিও তাহাকে পর্যবেক্ষণ করিতেছিল। নির্ভয় নিঃসঙ্কোচ দৃষ্টি। বলিল, তুমি কে?

ভাব দেখিয়া গঞ্জালেসের হাসি পাইল। বলিল, দেখতেই পাচ্ছ।

—ওঃ, তুমি স্যামুয়েল গঞ্জালেস্, তাই না? ঠাকুরদা তোমার খুব গল্প করছিল।

—তা হবে।

লিসি আর একবার ভালো করিয়া তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল: তুমি গাছে উঠতে পারো?

—গাছে? বিস্মিত হইয়া গঞ্জালেস্ বলিল, গাছে কেন?

—গাছে কেন কী? লিসিকে ততোধিক বিস্মিত মনে হইল: নারকেল পাড়তে হবে যে।

—নারকেল পাড়তে! না, সে আমি পারবো না।

অসীম অবজ্ঞা ও অনুকম্পায় লিসি চোখ মুখ কুঞ্চিত করিল: গাছে উঠতে পারো না তো অমন চেহারাখানা রেখেছ কেন? আমি গাছে উঠতে পারি তা জানো?

—সত্যি নাকি!

—ওঃ, বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?

কথাটা বলিবার অপেক্ষামাত্র, তারপরেই কিছু আর করিতে হইল না। চট্ করিয়া কাপড়-চোপড় একটু সামলাইয়া দা হাতে লিসি কাঠবেড়ালীর মতো তর্ তর্ করিয়া নারিকেল গাছে চড়িয়া বসিল। তারপর সেখান হইতে বিজয়িনীর মতো গলা বাড়াইয়া গঞ্জালেস্‌কে ডাকিয়া কহিল, এই দেখলে তো?

গঞ্জালেস্ দেখিল এবং দেখিবামাত্র ভাবান্তর ঘটিয়া গেল তাহার।

লিসি গাছ হইতে ঝুপঝাপ্ করিয়া গোটাকয়েক ঝুনো নারিকেল নীচে ফেলিয়া আবার তেমনি অবলীলাক্রমে নামিয়া আসিয়া সামনে দাঁড়াইল। আর সেই মুহূর্তে গঞ্জালেসের আত্মবিস্মৃতি ঘটিল। পরিশ্রমে লিসির তামাটে মুখখানা চমৎকার রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, কপালের প্রান্তে প্রান্তে ঘামের বিন্দু। তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া গঞ্জালেসের নেশা ধরিয়া গেল।

দু পা আগাইয়া আসিয়া হঠাৎ গঞ্জালেস্ লিসির একখানা হাত চাপিয়া ধরিল। বলিল, বাঃ, তুমি তো দেখতে বেশ!

লিসি ভ্রূভঙ্গী করিয়া হাত ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু খুব

যে এমন একটা ভয় পাইয়াছে তাহা মনে হইল না। বলিল, বেশ তো, তাতে তোমার কী ?

—কিছু কাজ আছেই তো। আচ্ছা, পছন্দ হয় আমাকে ?

হাত ছাড়াইয়া লিসি প্রস্থানের উপক্রম করিতেছিল, কিন্তু প্রশ্ন শুনিয়া সোজা ফিরিয়া দাঁড়াইল।

—কেন পছন্দ হবে তোমাকে ? নারকেল গাছে উঠতে পারো না, খালি লম্বা চওড়া চেহারা থাকলেই চলে ?

ব্যাপারটা গঞ্জালেস্ আরো সোজা করিয়া আনিল : আচ্ছা, নারকেল গাছে চড়াটা না হয় রপ্ত করে নেব। কিন্তু আমাকে বিয়ে করবে তুমি ?

—বিয়ে ! তোমাকে ! লিসি তাহার মঙ্গোলিয়ান মুখখানাকে এমন ভাবে বাঁকাইল যে গঞ্জালেস্ একেবারে সংকোচে জড়োসড়ো হইয়া গেল : তার চাইতে ভুঁড়ো ডি-সিল্‌ভাকে বিয়ে করলে ক্ষতি কী?

ভুঁড়ো-ডি-সিল্‌ভা ব্যক্তিটি কে, সে সংবাদটা জিজ্ঞাসা করিয়া লইবার আগেই বেগে লিসি গেল অদৃশ্য হইয়া। দূরে কোথা হইতে চমৎকার বাঁশির সুর বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল—বাজাইতেছিল জোহান।

লিসির কাটা-ছাঁটা স্পষ্ট জবাবে গঞ্জালেস্ কিন্তু খুশি হইয়া গেল। চর ইস্‌মাইলের এই রুদ্রতায় লিসির এমনি বন্যতাই তো স্বাভাবিক। আরো বিশেষ করিয়া পর্তুগীজদের রক্ত তাহার শরীরে। তাহার ঠাকুর্দা ইংরেজের আইনকে অস্বীকার করিয়া আফিঙের ব্যবসা চালাইয়া চলিয়াছে।

কথাটা শেষ পর্যন্ত ডি-সুজার কাছে সে পাড়িল।

ডি-সুজা এক রকম মুখিয়া ছিল বলিলেই হয়। দন্তহীন মুখে

প্রাণপণে যে মুরগীর ঠ্যাংটাকে সে কায়দা করিবার চেষ্টা করিতেছিল, কথাটা শোনা মাত্র সেটা ঠকাস্ করিয়া প্লেটের উপর খসিয়া পড়িল। ঝোলমাখা পাকা গোঁফ জোড়া খাড়া করিয়া ডি-সুজা বলিল, বটে বটে!

—যদি আপত্তি না থাকে—

—আপত্তি! কী বলছ তুমি! ডি-সুজা মুরগীর ঠ্যাং সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া গেল, বলিল, আমি তো সেই কথাই ভাবছিলাম। ডেভিডের ছেলে তুমি, তোমার মতো যোগ্যপাত্র আর কোথায় মিলবে। বললে বিশ্বাস করবে না, প্রথম যেদিন তোমাকে দেখেছি, সেদিন থেকেই ভাবছি লিসিকে তোমার হাতে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হব।

বিনয়ে গঞ্জালেস্ মাথা নত করিয়া রহিল।

ডি-সুজা কহিল, এর মতো সুখের কথা আর কী আছে। দাঁড়াও লিসিকে আমি এক্ষুণি ডাকছি।—বলিয়া ঝোল মাখা গোঁফজোড়া ফুলাইয়া চীৎকার করিয়া সে লিসিকে ডাকিল।

লিসি আসিয়া উপস্থিত হইল। ডি-সুজার মুখের অবস্থাটা লক্ষ্য করিয়া কহিল, কী হয়েছে? কেন মিছামিছি চ্যাঁচাচ্ছ অমন করে?

—বাঃ, চ্যাঁচাব না? এই—একে চিনিস্ তো? ডেভিড গঞ্জালেসের ছেলে?

বাঁকা কটাক্ষে গঞ্জালেসের দিকে চাহিয়া লিসি বলিল, হুঁ, খুব চিনি।

—খালি চিনলেই চলবে না।

—কী করতে হবে তবে?

—ওকে বিয়ে করতে হবে তোর।

—বিয়ে! কী সব যা তা বলছ ঠাকুর্দা! লিসি ঠাকুর্দাকে

হমকাইয়া উঠিল এক রকম। ডি-সুজা লিসির কথার সুরে থতমত খাইয়া গেল। তাহার আকস্মিক উৎসাহে মস্ত একটা আঘাত লাগিয়াছে।

—বিয়ে! যাকে তাকে ধরে বিয়ে করলেই হয় বুঝি!

—যাকে তাকে কিরে! ডেভিডের ছেলে যে ও—ডি-সুজা বিস্মিত শ্রদ্ধায় থামিয়া গেল। ইহার চাইতে বড় পরিচয় কী আর হইতে পারে মানুষের? অন্তত সে তো জানে না।

কিন্তু এ পরিচয়ে লিসি বিচলিত বা বশীভূত হইল না। বলিল, হলেই বা ডেভিডের ছেলে, নারকেল গাছে যে উঠতে পারে না সে খবর রাখো?

ডি-সুজা চটিয়া গেল: কেন, নারকেল গাছে ওঠাটা এমন কী ভয়ানক ব্যাপার? জানিস্, এমন ছেলে আজকালকার দিনে দেখা যায় না? কত বড় ব্যবসা, কত টাকা—কেমন সুখে রাখবে বল্ দিকি?

—ছাই!

ডি-সুজা তাতিতেছিল, আগুন হইয়া গেল একেবারে। চীৎকার করিয়া কহিল, এ সব কথা কার কাছে শুনেছিস্ তুই? জোহান বুঝি?

—তুমি আবার পাগলের মতো চ্যাঁচাচ্ছ ঠাকুর্দা!

নাঃ, চ্যাঁচাব না! ঝোল মাখা গোঁফ জোড়া শিকারী বিড়ালের মতো ফুলাইয়া ডি-সুজা সরোষে কহিল, পাজী, নচ্ছার, হতভাগা! মেরীর নাম করে বলছি, একদিন ওর সব কটা দাঁত উড়িয়ে দেব আমি।

গঞ্জালেস্ বোকার মতো বসিয়াছিল এতক্ষণ। বড় বেশি বাড়াবাড়ি হইয়া যাইতেছে বোধ করিয়া সে শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। বলিল, আহা-হা, কেন মিথ্যে মাথা গরম করছ।

—না, মাথা গরম করব না, একেবারে ঠাণ্ডা জল হয়ে থাকব।

জোহানের মতলব আমি কিছু বুঝি না আর? কেবল আমার বড় মোরগটা? লিসিকে শুদ্ধু বাগাবার চেষ্টায় আছে ও।

লিসি খানিকক্ষণ চোখ দুইটা বড় বড় করিয়া ডি-সুজার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে—অনেকটা যাদুকরেরা যেভাবে সম্মোহন-বিদ্যা প্রয়োগ করে সেই রকম। ফলও পাওয়া গেল অবিলম্বেই।

ডি-সুজা অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সুর নরম হইয়া আসিল তাহার। কহিল, বাঃ, অমন করে তাকিয়ে আছিস্ যে! আমি—আমি কি মিথ্যে বলছি নাকি?

লিসি গম্ভীর গলায় বলিল, হুঁ। ফের যদি তুমি ওই সব আবোল্ তাবোল্ বকবে, তা হলে আমি ঠিক ওই জোহানের সঙ্গে সোজা চলে যাব।

একবার আঁৎকাইয়া উঠিয়াই ডি-সুজা থামিয়া গেল।

সমস্ত ব্যাপারটা গঞ্জালেসের কিন্তু ভারী ভালো লাগিয়া গিয়াছিল। লিসির বন্যতাটা তাহার চোখে যত বেশি করিয়া পড়িতে লাগিল, ততই সে দিনের পর দিন প্রলুব্ধ বোধ করিতে লাগিল নিজেকে। মদটা তীব্র না হইলে নেশা জমিতে চায় না—একপাত্র হুইস্কির মতোই লিসি আকর্ষণ করিতেছিল তাহাকে। নারিকেল গাছে উঠিতে না পারিলেও সে প্রতীক্ষা এবং প্রত্যাশা করিয়া রহিল।

কিন্তু চর ইস্‌মাইলে পড়িয়া থাকিলেই গঞ্জালেসের চলে না। তাহার বিরাট ব্যবসা আছে—দায়িত্ব এবং কাজের অভাবও নাই। সুতরাং একদিন তাহাকে আবার চট্টগ্রামে ফিরিতে হইলই। যাইবার আগে সে আশা লইয়া গেল যে লিসির কৃপাদৃষ্টি শেষ পর্যন্ত তাহার উপরে নিশ্চয়ই পড়িবে।

ডি-সুজা কহিল, ডেভিডের ছেলে তুমি—আমাদের গৌরব। বাপের নাম বাঁচিয়ে রাখা চাই। শুভেচ্ছাটা গঞ্জালেস্ মাথা পাতিয়া লইল বটে কিন্তু বাপের নাম বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য খুব প্রবল একটা উৎসাহ বোধ করিল না। ডেভিডের চরিত্রের দুঃসাহসিক দিকটাকেই সে শ্রদ্ধা করিয়াছে শুধু, তাহার কার্য-তালিকা খুব অনুকরণযোগ্য বলিয়া ভ্রম তাহার কখনো হয় নাই।

২

ইহার পরে ছয় মাসের মধ্যে গঞ্জালেস্ আর চর ইস্‌মাইলের খোঁজ খবর নিতে পারে নাই।

নদীতে জোয়ার-ভাঁটা চলিতে লাগিল অব্যাহত নিয়মে, বসন্তের স্পর্শে নদীর জল আরো বেশি করিয়া লবণাক্ত হইয়া আসিল। বিলে কলমীর ফুল ফুটিল—শ্যাওলার মধ্যে বুনো-হাঁস চোখ বুজিয়া রোদ পোয়াইতে লাগিল, আর নদীর স্রোতে বহিয়া আনা প্রচুর পলি-মাটির সহায়তায় জীবন-কীটেরা নূতন উপনিবেশের বীজ রচনা করিয়া চলিল।

এমনি একদিনে—এক বৈশাখী অপরাহ্নে উপনিবেশের উপর দিয়া কালো ঝড় ঘনাইয়া আসিল।

তাণ্ডব শুরু হইল নদীতে—ফেনার মুকুট তুলিয়া কালো কালো ঢেউ আসিয়া আছড়াইয়া পড়িল তীরের গায়ে। ধ্বংসাবশিষ্ট গীর্জাটার পাশে সেখানে রাশি রাশি গাছের শিকড় জলের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে, ওখানে ঝর্ ঝর্ করিয়া মাটি জলে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে ফোঁটায় ফোঁটায় রক্তও চোঁয়াইতে লাগিল—জোহানের রক্ত।…

বর্মীদের বজরাটা ইহার মধ্যে কতদূরে চলিয়া গেছে কে বলিবে। ঝড়ের মুখের পাল তুলিয়া দিয়াছে তাহারা। তেঁতুলিয়ার মোহনা পার হইয়া সমুদ্রের দোলায় দুলিতে দুলিতে তাহারা চলিয়াছে ইরাবতীর দেশে। সেখানে এখন পাহাড়ে পাহাড়ে ফুল ফুটিতেছে, প্যাগোডা হইতে ধূপের গন্ধ উঠিতেছে, শত শতাব্দীর নখর-চিহ্নকে অস্বীকার করিয়া বরাভয় বিতরণ করিতেছে ধ্যানমগ্ন শিলামূর্তি। ম্লান আলোয় চকিতের জন্য তাহাদের বজরায় লিসির ভয়ার্ত মুখখানা দেখা গেল, তারপরেই হয় তো তাহা দৃষ্টির বাহিরে চিরদিনের মতো বিলীন হইয়া গেল।···বর্মীটা হাসিতেছে। পর্তুগীজদের বীরত্বের আদর্শ হইতে যে শিক্ষা সে লাভ করিয়াছে—সে শিক্ষা এম্‌নি করিয়াই কাজে লাগাইল শেষ পর্যন্ত।

কিন্তু ঝড় চলিতেছে তেঁতুলিয়ায়। কালো অন্ধকারে ঈগলের মতো পাখা মেলিয়া বজরার দুর্দম গতি দিকচক্র-বালে দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া গেল।

আর হরিদাস সাহার পান্‌সী নৌকা? এই প্রলয়-তুফানে তাহা নির্বিঘ্নেই পাড়ি জমাইতেছে কি? অথবা সৃষ্টিছাড়া যাযাবরের সমস্ত যাত্রা আসিয়া শেষ হইয়া গেছে রাক্ষসী-নদীর মৃত্যু তাণ্ডবে? কেরামদ্দীর ভাবনা কোথাও যেন কূল পাইতেছিল না।

কিন্তু সব চাইতে কঠিন সমস্যা বোধ করিতেছিলেন কবিরাজ বলরাম মণ্ডল ভিষক্‌রত্ন।

মুক্তো উচ্ছ্বসিত ভাবে কাঁদিতেছে। খোলা জানলা দিয়া জলের ছাট তাহার সমস্ত মুখে ছড়াইতেছে, চুল কপাল বাহিয়া বৃষ্টির জল গড়াইয়া পড়িতেছে, আর তাহার সঙ্গে মিশিতেছে চোখের জল। বৃষ্টিতে

কাপড়টা ভিজিয়া দেহের সঙ্গে সংলগ্ন হইয়া গেছে—শরীরের রেখায় রেখায় নির্ভুলভাবে আসন্ন মাতৃত্ব।

বাইরে ঝড়ের বিরাম নাই। ঘরের মধ্যে ক্ষিপ্ত বাতাস ঢুকিয়া তাণ্ডব করিতেছে যেন—কিন্তু মুক্তোর তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই বিন্দুমাত্রও। আর বলরাম তাকাইয়া আছেন বজ্রাহতের মতো! ব্যাপারটা অসম্ভব কিছু নয়, বরং এর চাইতে সঙ্গত এবং সম্ভব কিছুই নাই। তবু বলরাম কী বলিবেন ভাবিয়া পাইলেন না, কেবল মুক্তোর কাতর মুখটা তাঁহার দৃষ্টির সামনে জাগিতে লাগিল দুঃস্বপ্নের মতো।

বলরাম কহিলেন, কেঁদে কী হবে মুক্তো। ব্যবস্থা একটা তো করতেই হবে।

মুক্তোর চোখ জ্বলিয়া উঠিল, ব্যবস্থা! ব্যবস্থা আবার কী করবে! এই জন্যেই তুমি এত আদর করে আমাকে এখানে নিয়ে এসেছিলে, আমার সর্বনাশ করবার জন্যে?

—সর্বনাশ! তাই তো।

বলরাম ঘাড় এবং মাথা চুলকাইতে লাগিলেন। সর্বনাশ—তা বটে। বংশরক্ষা করাটা দেহধর্মের প্রধান কর্তব্য; বংশধরের মুখ দেখিয়া আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে মানুষের মন। কিন্তু সেই বংশধর যে সময়বিশেষে কী ভয়ানক শত্রু হইতে পারে সেটা অনুভব করিয়া বলরাম অত্যন্ত স্নায়বিক উত্তেজনা বোধ করিতে লাগিলেন।

চর ইস্‌মাইলের এই নির্জন সমাজহীন দেশ—এখানে অনেক কিছুই সম্ভব হইতে পারে, কাজেই মোটের উপর একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার কিছু নয়। কিন্তু—

মুক্তো আবার বিলাপ করিয়া কহিল, আমার তখনই সন্দেহ হয়েছিল

আমার সর্বনাশ করাই তোমার মতলব। তবুও বিশ্বাস করেছিলুম। ভেবেছিলুম—

বলরাম চটিয়া গেলেন—পৌরুষটা বেশ সজাগ হইয়া উঠিতেছে এতক্ষণে।, সব দোষ বুঝি তাঁহার ঘাড়ে গিয়া পড়িল শেষ পর্যন্ত। এই সর্বনাশের জন্য মুক্তোর যেন কোনো দায়িত্বই নাই। গঙ্গাজলে ধৌত বিশুদ্ধ একটি তুলসীপত্র আর কি! তবু যদি সব কথা বলরাম না জানিতেন। দেশে থাকিতে সে যে কতগুলি ছেলের মাথা খাইবার উপক্রম করিয়াছিল সেটা তো আর জানিতে বাকী নাই কাহারও। ইহাকেই বলে কলিকাল!

বলরাম চটিয়া গেলেন—শুধু মুক্তোর উপরে নয়, সমস্ত পৃথিবীর উপরেই। কাহারো ভালো করিতে নাই জগতে, ভালোবাসিতে নাই কাহাকেও। এতদিন বেশ তো কাটিতেছিল, দয়া-পরবশ হইয়া মুক্তোকে আশ্রয় দিয়াই না এই বিভ্রাট ঘটিল। কী অন্যায় তিনি করিয়াছেন? শুধু আশ্রয় দিয়াছেন বলিলে কম বলা হয়—মাথায় তুলিয়া রাখিয়াছেন বলিলেও যথেষ্ট বলা হয় না। কাপড় চোপড়, ভালো খাবার দাবার, এমন কি, দু-চারখানা গয়না পর্যন্ত। বলরাম তো আর দেবতা নন যে কেবল দিয়াই চলিবেন, তাহার পরিবর্তে একটুকু দাবি তাঁহার থাকিবে না। মুক্তোর এমন রূপ-যৌবনও বৃথাই তো নষ্ট হইতেছিল।

ঝড় চলিতেছে সমানে। একটা অশ্রান্ত সোঁ সোঁ শব্দ আর ঘনাইয়া আসা তরল অন্ধকারের অতি তীব্র গতিশীলতা। হুড়মুড় করিয়া একটা নারিকেল গাছ ভাঙ্গিয়া পড়িল বুঝি। তেঁতুলিয়ার জলে যে মাতন চলিতেছে, এখান হইতেও তাহা যেন অনুভব করা যায়।

কিন্তু এই অবাঞ্ছিত আগন্তুক। মুক্তোর গর্ভে যে শিশু আসিতেছে

তাহাকে লইয়া কী করা যাইতে পারে? বলরাম ভাবিতে লাগিলেন। মনের সামনে অনেকগুলি শিকড়-বাকড়ের নাম খেলিয়া গেল, বলরামের কবিরাজী প্রতিভা জাগিয়া উঠিতেছে। এখন এই একটা মাত্র পথ খোলা আছে—কিছু হয় তো এতেই হবে।

ঘরের মধ্যে অন্ধকার ঘনাইতেছে। ঝড়টা এইবারে থামিবে বোধ হয়—মুক্তো এখন একটা আলো জ্বালিয়া দিয়া গেলে পারিত। কিন্তু আজ আর আলো জ্বালিবার উৎসাহ নাই তাহার।

দরজায় জোর ধাক্কা পড়িল কয়েকটা।

বলরাম উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিতেই রাধানাথ প্রবেশ করিল। ভিজিয়া ভূত হইয়া আসিয়াছে। ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া দাঁড়াইতেই ছোটখাট একটা নদী বহিয়া গেল যেন।

বলরাম বিস্মিত হইয়া কহিলেন, কোত্থেকে এলি।

রাধানাথ কহিল, কোত্থেকে আবার আসব! দিদিমণি পাঠিয়েছিলেন—পথে আসতে আসতেই ঝড়ে ধরে নিলে। একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়েছিলুম—হুড়মুড় ক'রে একটা মস্ত ডাল আমার গা ঘেঁষে পড়ল বাবু। আর দু হাত এদিকে পড়লেই রাধানাথের আর পাত্তা মিলত না।

—পাত্তা না মিললেই ভালো হত। কুড়ের বাদশা কোথাকার।

—আজ্ঞে আপনি তো বলছেন ভালো হত, কিন্তু রাধানাথের রাধা যে বিধবা হত সে খেয়াল নেই বুঝি?

উত্তর-দায়ক ভৃত্যের রসিকতার দুশ্চেষ্টা দেখিয়া আরও ক্ষেপিয়া গেলেন বলরাম। কহিলেন, যা, যা, ফ্যাক্ ফ্যাক্ করিস নি। কিন্তু দিদিমণি কোথায় পাঠিয়েছিল?

রাধানাথের স্বরেও এবার অসন্তোষ প্রকাশ পাইল, তুমি যে সদরের উকিলের মত জেরা শুরু করলে বাবু, ভিজে কাপড়ে কতক্ষণ জবাব দেব শুনি ? ওষুধ আনতে পাঠিয়েছিল।

—ওষুধ ! কী ওষুধ ?

—এই দেখ না—রাধানাথ কোঁচড়টা খুলিয়া দেখাইয়া দিল। আধো অন্ধকারের মধ্যে দেখা গেল, একরাশ সবুজ উজ্জ্বল ফল বৃষ্টিতে ভিজিয়া তাহার কাপড়ের মধ্যে চিক চিক করিতেছে।

—কী ফল রে ওগুলো ? বলিয়া একটা ফল হাতে তুলিয়া লইতেই ভয়ে ও বিস্ময়ে বলরাম কথা কহিতে পারিলেন না। করবী ফুলের একরাশ গোটা। এগুলি ওষুধই বটে—ভবরোগের ওষুধ—কয়েকটা বাটিয়া খাইলেই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে নশ্বর দেহযন্ত্রণাটা বেশিক্ষণ ভোগ করিতে হয় না। বিসূচিকার লক্ষণ প্রকাশ পায়, কিছুটা রক্ত বমি হইয়া তারপরেই—ব্যাস্ ! মুক্তোর মতলব তাহা হইলে—

কথাটা ভাবিতে গিয়াও বলরামের মস্তিষ্কের সমস্ত কোষগুলি একসঙ্গে যেন ঝন্ ঝন্ শব্দ করিয়া বাজিয়া উঠিল। আত্মহত্যার মতলব আঁটিতেছিল মুক্তো ! ব্যাপারটা কি এতদূর পর্যন্ত গড়াইয়াছে যে আত্মহত্যা না করিয়া তাহার হাত হইতে আর নিষ্কৃতি নাই ! কিন্তু পুলিশে একবার খবর পাইলে ফাঁসির দড়ি তাঁহারই গলায় আঁটিয়া বসিবে যে !

ব্যাপারটার সূচনামাত্র অনুধাবন করিয়াই রোষে বলরাম বিদীর্ণ হইয়া পড়িলেন।

—আমাকে ফাঁসিতে চড়াবি তোরা ! হতভাগা উজবুক কোথাকার ! যাইবার জন্য পা বাড়াইতেছিল রাধানাথ, কিন্তু বলরামের এই আকস্মিক বিস্ফোরণে থমকিয়া দাঁড়াইল।

—কী হয়েছে ?

—কী হয়েছে ? কী হয় নি তাই শুনি ? উঃ, কী ভয়ানক লোক সব ! তলে তলে এই কাণ্ড চলেছে !

—বক্ বক্ করে মরো গে তুমি, আমি চললুম—রাধানাথ সত্যি সত্যিই চলিয়া গেল।

অন্ধকারের মধ্যে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন বলরাম। ব্যাপারটা অপ্রত্যাশিত রূপ লইতেছে। সন্তান আসিতেছে—আসুক না। যদি কোনমতেই ঠেকানো না যায় তাহা হইলে গলা টিপিয়া মারিয়া তেঁতুলিয়ার জলে ফেলিয়া দিলেই চলিবে। এ তো ফরিদপুর নয় যে চৌকিদার হইতে আরম্ভ করিযা একেবারে বড়লাট পর্যন্ত ইংরেজের আইন সঙ্গীন্ খাড়া করিয়া আছে।

কিন্তু মুক্তো ? জীবন সম্বন্ধে কেন সে এত তিক্ত হইয়া উঠিতেছে, কেন এমন আকস্মিক ভাবে সে নিজেকে শেষ করিয়া দিতে চায় ? দেশে গাঁয়েও তো এমন কত ঘটনা হয় বলরাম কি তাহা জানে না ? ডাক্তার কবিরাজের পিছনে কয়েকটা টাকা খরচ করিলেই ত যথেষ্ট। দিনকয়েক কানাঘুসা, সামান্য কিছু আলোচনা—তাহার পরেই আর কোন কলরব নাই। যেমন চলিতেছিল—তেমনি ভাবেই কাটিয়া চলে যথানিয়মে।

অন্ধকারে দাঁড়াইয়া মুক্তোর বৃষ্টিসিক্ত করুণ মুখখানির কথা ভাবিয়া বলরাম এই মুহূর্তে কেন যেন অত্যন্ত বেদনা বোধ করিতে লাগিলেন। হাজার হউক, মুক্তো তাঁহার আশ্রিত, একেবারে অতটা না করিলেও চলিত। কিন্তু সেই সব মুহূর্ত—রক্ততরঙ্গিত স্নায়ুতে সেই মূঢ় বিহ্বলতা। কতদিন যে বলরামের কাটিয়াছে শুষ্ক নিঃসঙ্গতায়, নারীসঙ্গহীন তীব্র একাকিত্বে। বলরাম ভীরু, বলরাম কাপুরুষ।

সেই ভীরু যখন তাহার চাইতেও ভীরুকে হাতের মুঠোর মধ্যে পাইয়াছে, তখন তাহার মধ্যে অত্যাচারী পশুশক্তিটা দেখা দিয়াছে দ্বিগুণ রূপ লইয়া। যে দুর্বল চিরদিন সকলের কাছে লাঞ্ছনা স্বীকার করিয়াই আসিয়াছে, সে যখন তাহার চাইতে দুর্বলকে আয়ত্তের মধ্যে পায়, তখন ক্ষুধার্ত বাঘের মতো হইয়া উঠে তাহার মূর্তি। সকলের কাছ হইতে যাহা সে পাইয়াছে, সে বস্তু একজনকেই সম্পূর্ণভাবে বর্ষণ করিয়া মানসিক ক্লীবত্বের ঋণমুক্ত হইতে চায় সে।

ঝড় থামিয়া গেছে সম্পূর্ণভাবে। শুকনো পাতার উপর থাকিয়া থাকিয়া ঝর্ ঝর্ শব্দে এক এক পশলা জল ঝরিয়া পড়িতেছে মাত্র। তেঁতুলিয়ার গর্জন আর শোনা যায় না। শুধু ঘরের মুক্তো এখনো নিতান্ত অকারণে ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে। আর কাচভাঙা দেওয়ালে ঘড়িটা ক্রমাগত টক্ টক্ করিতেছে—যেন অত্যন্ত জোরে, অত্যন্ত অস্বাভাবিক ভাবেই।

৩

উৎসব শেষ হইয়া গেল।

আকাশের প্রান্তে যাহারা কালো কালো মৃদঙ্গে ঘা মারিয়া নদীর উপর নাচিতে শুরু করিয়াছিল, তাহাদের আর খুঁজিয়া পাইবার জো নাই। কোঁকড়ানো চুলের মতো নদীর জল এখনও ফুলিয়া উঠিতেছে—দিক দিগন্তে ফস্‌ফরাসের উজ্জ্বল দীপ্তি-কণিকা ফুটিয়া পড়িতেছে, ফাটিয়া পড়িতেছে এখনও। কিন্তু তাহাকে দেখিয়া আর ভয় করে না। ওপার হইতে চাঁদ উঠিয়া আসিতেছে: নদীর মুখের উপর হইতে কে একখানা কালো ঘোমটা সরাইয়া নিল যেন। জলের হাসি দেখিলে এখন

কাহার মনে হইবে যে একটু আগেই পাতাল হইতে একশোটা রাহু পৃথিবীর সমস্ত আলো গিলিয়া খাইবার জন্য ইহার তলা হইতে ঠেলিয়া উঠিয়াছিল।

উৎসব শেষ হইয়া গেল—যাহারা উৎসবে যোগ দিয়াছিল, ঝোড়ো হাওয়ায় পাখা মেলিয়া উড়িয়া গেছে তাহারা। শুধু চাঁদ নয়, মেঘের আড়াল সরিয়া ধোঁয়াটে তারাগুলি ক্রমেই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। সপ্তর্ষি নামিতেছে একেবারে জলের কোল পর্যন্ত। কেবল উৎসবের সাক্ষী হইয়া আছে ভূলুণ্ঠিত কতকগুলি সুপারী গাছ—আর নাচের সময় কাহার হাত হইতে একটা সোনার বালা যে খসিয়া পড়িয়াছিল তাহারি উত্তাপে দীর্ণদগ্ধ একটা তালগাছ হইতে এখনো উৎকট গন্ধকের গন্ধ উঠিয়া আকাশ বাতাসকে ছাইয়া ফেলিতেছে—মুমূর্ষুর খানিক বিষাক্ত নিশ্বাসের মতো।

ঝড় থামিতেই ডি-সিল্‌ভার মনে হইল, গোরুগুলির একবার খোঁজ লইলে ভালো হয়। ঝড শুরু হইবার আগে তাহাদের সবগুলি ফিরিয়া আসে নাই, গাছ চাপা পড়িয়া দু-একটা মরিয়াছে কিনা কে বলিবে। বিশেষত শাদা-কালোয় মিশানো যে বড় গোরুটা দু বেলায় পাঁচ সের করিয়া দুধ দেয় তিন-চার দিনের মধ্যেই বাচ্চা হইবে সেটার। এই দুর্বৎসরে সেটা খোয়া গেলে বিলক্ষণ ক্ষতি হইয়া যাইবে।

একটা লণ্ঠন লইয়া ডি-সিল্‌ভা বাহির হইয়া পড়িল। বৈশাখ আসিতে অবশ্য দু মাস দেরী, তবু ইহাকে চরের প্রথম কালবৈশাখী বলা যাইতে পারে। জোরটা নেহাৎ কম হয় নাই। নদীতে কতগুলি নৌকা যে মারা পড়িয়াছে কে জানে। দু-একটা মড়া আসিয়া চরে ঠেকিলে হয় তো সেটা সঠিকভাবে জানিতে পারা যাইবে। গাছ

অনেকগুলি পড়িয়াছে। জোহানের চালা হইতে তিন-চারখানা টিন আসিয়া উড়িয়া নামিয়াছে রাস্তায়।

চাঁদ উঠিয়াছে বটে, কিন্তু নানা গাছের ছায়ায় খানিকটা ঘন অন্ধকার। পায়ের তলায় জল ছপ্ ছপ্ করিয়া উঠিতেছে, ওপাশ দিয়া ওটা কী চলিয়া গেল? বাপ্‌রে—প্রকাণ্ড একটা খ'য়ে জাতি! চার হাতের কম লম্বা হইবে না। ডি-সিল্‌ভা লাফাইয়া তিন পা সরিয়া গেল। কিন্তু লিসির মতোই সাপটাও ডি-সিল্‌ভাকে নগণ্য বোধ করিল কিনা কে জানে—অন্তত লক্ষ্য করিল না।

ঝড়ের পরে চর ইস্‌মাইল ঘুমাইয়া আছে শিশুর মতো শান্ত হইয়া। কোথাও কোনো কলরব নাই, সব যেন রহস্যময় ভাবে নীরব। অন্ধকার গ্রামের পথে ডি-সিল্‌ভার ভয় করিতে লাগিল। এখানে ওখানে জমাট-বাঁধা জোনাকীর পুঞ্জ—আলোগুলো যেন ভূতের মতো দেখিতে। নূতন বৃষ্টির জল পড়িয়া ভিজা ঝরা পাতা আর কাদার গন্ধ উঠিতেছে।

ডি-সিল্‌ভা চিৎকার করিয়া ডাকিল, জোহান, জোহান!

পাত্তা মিলিল না।

—এই সন্ধ্যে-বেলায় ঘুমিয়ে পড়লে নাকি? জোহান!

তবুও সাড়া মিলিল না।

ওপাশেই ডি-সুজার বাড়ি। এও যেন একটা ঘুমন্তপুরী হইয়া আছে। কোনখানে একটা সাড়াশব্দ পাইবার যদি আর জো থাকে। অবশ্য, ডি-সিল্‌ভা প্রাণ গেলেও ডি-সুজার সঙ্গে যাচিয়া আর আলাপ করিতে রাজী নয়—বিশেষত সেদিনের সেই ব্যাপারের পর। সে ভুঁড়ো, সে অকর্মা—এসব অপবাদ এবং অপমান ডি-সিল্‌ভা মরিয়া গেলেও ভুলিবে না কোনোদিন। বরং যেমন করিয়া হোক ইহার শোধ লইবে!

মেরীর নাম করিয়া সে শপথ করিয়াছে, চালাকি নয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এমন সময়—এইরকম অন্ধকারের মধ্যে ডি-সুজার এক-আধটা কাশির আওয়াজ শুনিতে পাইলেও খুশি হইত মনটা।

তিন-চারটা গাছ পড়িয়াছে ডি-সুজার। দরজাটা হাঁ করিয়া খোলা। বাড়িতে মানুষ নাই নাকি? ডি-সিল্‌ভার আরো খারাপ লাগিতেছে। পথ চলিতে চলিতে ডি-সিল্‌ভা নিজের মনে গুন্ গুন্ করিয়া বাইবেল আওড়াইতে লাগিল। কিন্তু অস্থির চঞ্চল মন—ঈশ্বর আর শয়তানের মধ্যে বারে বারে গণ্ডগোল বাধিয়া যাইতেছে। ঈশ্বরের কৃপা চাহিতে গিয়া সে বারে বারেই চাহিতেছে শয়তানের কৃপা।

দুত্তোর শয়তান! একেবারে মাথা খারাপ হইয়া গেল নাকি তাহার? চুলোয় যাক গোরু—এমন রাত্রে সেটাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা না করিলেই হইত। তা ছাড়া যে সাপ সে দেখিয়াছে, ওই রকম আর একটা ফণা তুলিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেই তো—

ডি-সিল্‌ভা ফিরিয়া যাইবার প্রেরণা বোধ করিতে লাগিল। কিন্তু জঙ্গলের আড়ালটা সরিয়া গেছে—এতক্ষণে মাথার উপর তারা-ভরা আকাশ ও চাঁদ ঝলমল করিয়া উঠিয়াছে। আর ওদিকে পোস্ট অফিসের জানালায় একটা বড আলো জ্বলিতেছে, তবে আর ভয়টা কিসের?

ভাঙা গির্জার ওদিকটায় একবার খুঁজিয়া আসিতেই হইবে।

ভয়টা অবশ্য ওদিকেই—এক সময়ে ওখানে গোরস্থান ছিল। লোকে বলে, জায়গাটা জিন-পরীর আস্তানা। তবে গোরস্থান বলিতে বিশেষ কিছু আর অবশিষ্ট নাই। ডি-সিল্‌ভার চোখের সামনেই তো প্রতিবছর একটু একটু করিয়া ভাঙিতে ভাঙিতে তাহা প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গেছে। তবুও—

সাহসে ভর করিয়া ডি-সিল্‌ভা আগাইয়া চলিল।

গাছের ছায়ায় শাদা মতো কী পড়িয়া আছে ওটা? তাহার গোরুটাই নয় তো? বসিয়া বসিয়া জাবর কাটিতেছে বোধ হয়। সমস্ত গ্রামটা খুঁজিয়া খুঁজিয়া সে হয়রাণ, আর এদিকে—

কিন্তু কয়েক পা আগাইতেই ভয়ে ডি-সিল্‌ভার মাথার চুলগুলি খাড়া হইয়া গেল। গলা হইতে একটা চিৎকার বাহির হইতে আসিতে না আসিতেই থামিয়া গেল অর্ধপথে! হাত হইতে লণ্ঠনটা মাটিতে পড়িয়া বার কয়েক দপ্‌ দপ্‌ করিল, তারপরেই নিবিয়া গেল সেটা। যা দেখিয়াছে তা যেন এখনো বিশ্বাস হইতেছে না।

জোহানের রক্তাক্ত কবন্ধ দেহটাই চোখে পড়িয়াছিল ডি-সিল্‌ভার।

বর্মী মেয়েই শেষ পর্যন্ত দরজা খুলিয়া দিল। বলিল, বড় বেশি অন্ধকার, তাই না?

কথা কহিবার প্রেরণা ছিল না। তবু মণিমোহন জবাব দিল, তা হোক, টর্চ আছে আমার সঙ্গে।

বর্মী মেয়ে তাহার টুক্‌টুকে ঠোঁট দুটিতে মিষ্টি একটুখানি হাসি ফুটাইয়া তুলিল।

—আর কোনোদিন এদিকে আসবে না বোধ হয়।

—না!

—আমার ওপর রাগ করেছ তুমি।

—কারো ওপর কোনো রাগ নেই আমার—মণিমোহন আর কথা বাড়াইতে চাহিল না। বড় বড় পা ফেলিয়া সে চলিতে লাগিল। সমস্ত শরীর মনে অসহ্য গ্লানি আর বিরক্তি। স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে

সে। এই ঝড়ের সন্ধ্যা তাহার জীবনে থাকিবে একটা দুঃস্বপ্ন হইয়াই।

দূর হইতে বর্মী মেয়ের গলা ভাসিয়া আসিল, আবার এসো।

মণিমোহন জবাব দিল না!

ঝরা পাতা, কাদা আর অন্ধকার। টর্চের আলোয় পথটা জ্বলিয়া উঠিতেছে তরল কাদায়। রবারের জুতা বারে বারে পিছলাইয়া পড়িতে চায়। কিন্তু মণিমোহনের মনটা নিজের মধ্যেই তলাইয়া গিয়াছিল।

ক্ষুধা কত তীব্র হইতে পারে মানুষের, আর কেমন অসংকোচেই সেটা যে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। দ্বিধা নাই, সংশয় নাই, ভাবনা নাই। কী হইতে পারে এবং কী যে হইতে পারে না তাহা লইয়া বিচলিত হওয়া অসম্ভব এবং অবান্তর। রূপকে যদি আগুন বলা যায় তাহা হইলে সে রূপের দাহিকা-শক্তি সম্বন্ধে আর এতটুকু সংশয় নাই মণিমোহনের মনে।

কিন্তু একথা কি কখনো ভাবিতে পারিত রাণী? বর্ধমানের সেই গ্রাম। আমের জামের ছায়ায় ঝিমাইয়া-আসা সন্ধ্যা। এখন ফাল্গুন মাস—অজস্র মুকুল ধরিয়াছে চারিদিকে, মহুয়ার গন্ধের মতো অত্যুগ্র একটা মাদক-সৌরভে মাঠ-ঘাট-বন ছাইয়া গেছে। তুলসী-মঞ্চের তলায় ছোট একটা মাটির প্রদীপে শিখাটা কাঁপিতেছে মৃদু মৃদু। দূরের স্টেশনে সন্ধ্যার লোকাল আসিয়া থামিল কলিকাতা হইতে—অলসভাবে হুইশিল বাজাইয়া আবার চলিয়া গেল। রাণী উৎকর্ণ হইয়া কান পাতিয়া আছে। এখনই বাহিরে কাহার জুতার শব্দ শোনা যাইবে বোধ হয়।

মৃদু জীবন—শান্ত আর মন্থর। একশো বছর আগে যাহা ছিল তাহাই। গ্রামের তলা দিয়া যে নদী বহিয়া গেছে, এক বর্ষাকাল ছাড়া সব সময়েই হাঁটু অবধি কাপড় তুলিয়া সে নদী পার হইয়া যাওয়া চলে।

দুই পারে ভাঁটফুল ফুটিয়াছে, কখনো কখনো তাহার দু-চারটি কেউ বা নদীর জলে ভাসাইয়া দেয়। সে নদীতে প্রদীপ ভাসিয়া চলে, ভাসিয়া যায় কাগজ আর মোচার খোলার নৌকা। শুকনার সময় শ্যাওলার মধ্যে হাতড়াইয়া গুগ্‌লি আর চিংড়ি মাছ ধরে গ্রামের বাগ্দীরা।

আর এখানে? যেটুকু মাটি তাহা তো নদীর করুণাতেই নিজেকে সঁপিয়া দিয়া বসিয়া আছে। নূতন চর জাগিতেছে প্রত্যহ—নূতন মানুষ আসিয়া দেখা দিতেছে নূতন পেশী আর নূতন হিংস্রতা লইয়া। মাটিকে বিশ্বাস নাই—চোরাবালি হাঁ করিয়া আছে। ফাল্গুনের আমের মুকুলের গন্ধ নাই—আছে আকাশের কোণে কোণে ঝড়ের মুখবন্ধ। আর এই জগতের প্রেম? রাণীর মতো তাহা উৎকণ্ঠ এবং উৎকর্ণ হইয়া প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে না—কাড়িয়া লয়—ছিনাইয়া লয়।

এখানকার যোগ্য নয় মণিমোহন। এই হিংসা আর পশুত্বকে দেখিয়া তাহার বিস্ময় জাগে, কিন্তু শ্রদ্ধা আসে না। আদিম অমার্জিত যাহা—তাহার মধ্যে বিশালত্ব আছে, কিন্তু রূপ নাই। তাহা আগুন লাগাইতে পারে, আলো জ্বালাইতে পারে না।

সমস্ত দেহটা বিশ্রীভাবে বিস্বাদ আর কুৎসিত লাগিতেছে। ওই বর্মী মেয়েটাকে ভাবিতে গিয়াই তাহার সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিতেছে। নিজেকেই কি সে আর বিশ্বাস করে? পাত্র যখন কানায় কানায় ফেনাইয়া উঠিতেছে, তখন সে কতক্ষণ ধরিয়া নিজেকে রাখিতে পারিবে শান্ত এবং সংযত করিয়া?

যা থাকে কপালে, এখানকার চাকরী সে ছাড়িয়াই দিবে। তারপর কলিকাতা। ট্রাম বাস মোটরের কলিকাতা! পরিচিত মুখ, চেনা রেস্তোরাঁ। লেকে পার্কে আর সিনেমায় সেই সব মেয়ের মুখ:

যাহারা মোহ জাগাইয়া দেয়, কল্পনাকে প্রসারিত করে। আগুন নয়, খোলা জানালার ফাঁকে বিদ্যুতের আলোর মতো। রাত্রির চৌরঙ্গী—মেট্রো সিনেমা। াওয়ার মার্কেট। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্ মেয়ের গা হইতে পাউডারের গন্ধ।

চটকা ভাঙ্গিয়া গেল। কোথায় কলিকাতা! উপনিবেশের নারিকেল বীথিতে বাতাসের মর্মর। নদী হইতে ঠাণ্ডা বাতাসে শীত করিতেছে। শিয়াল ডাকিতেছে দূরে। বৃষ্টি ভেজা বন হইতে উড়িয়া-আসা একদল পোকা টর্চের আশ্চর্য আলোটার রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করিতেছে। সামনেই তাহার বোট।

টর্চের আলো দেখিয়া গোপীনাথ একটা লণ্ঠন লইয়া অত্যন্ত দ্রুত-গতিতে নামিয়া আসিল। বলিল, আমরা ভেবে ভেবে হয়রাণ। এই ঝড়ের মাঝখানে কোথায় ছিলেন বাবু?

মণিমোহন সংক্ষেপে কহিল, গাঁয়ের মধ্যে।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া গোপীনাথ বলিল, আমরা তো ভেবে কূল পাই না। সবাই মিলে আপনাকে খুঁজতে বেরোচ্ছিলুম! কী ভয়ানক ঝড়—দেখেছেন! একটু হলেই বোটটাকে উড়িয়ে নিত আর কী!

রবারের জুতাটা কাদায় ভরিয়া গেছে। নদীর জলে জুতা-শুদ্ধ পা দুইটা ধুইয়া মণিমোহন বোটে উঠিয়া আসিল।

গোপীনাথ বলিল, তা হলেও ছাড়ি নি। মুরগী দুটো বানিয়েছি বেশ করে। টাকা না দিক, বুড়ো মজঃফর মিঞা মাঝে মাঝে এ রকম দু-চারটে মুরগী খাওয়ালে মন্দ হয় না নেহাৎ।

ক্লান্তভাবে মণিমোহন বিছানাটার উপর গড়াইয়া পড়িল। বলিল, বেশ তো, ভালো করে খেয়ে নাও! আমি আর রাত্রে কিছু খাব না।

—খাবেন না ? গোপীনাথের কণ্ঠস্বর বিস্মিত এবং আহত শুনাইল, এত ভালো করে রান্না করলুম বাবু আপনি না খেলে—

—আমি খেয়ে এসেছি।

—খেয়ে এসেছেন ! এই গাঁয়ের মধ্যে !

—হুঁ।

গোপীনাথ আরো বিস্মিত হইয়া গেল : এই সব মুসলমানেরা ! এরা আবার আপনাকে কী খেতে দিলে বাবু ?

—সে অনেক কথা। মণিমোহন গম্ভীর হইয়া রহিল।

অতএব গোপীনাথ চুপ করিয়া গেল, কিন্তু তাহার বিস্ময়ের অন্ত রহিল না। এই গ্রামে এমন কোন লোক আছে যে আদর আপ্যায়ন করিয়া সরকারীবাবুকে খাইতে দিবে। সন্ধ্যার সময় এক এক কাঁসি পান্তা ভাত গিলিয়াই তো ইহারা নিশ্চিন্তে রাত কাটাইয়া দেয়। আরো এই ঝড়—

সে যাই হোক, অত ভাবিয়া গোপীনাথের কাজ নাই। বারো টাকা মাহিনার কর্মচারী সে। ভদ্রলোকের ছেলে বলিয়া মণিমোহন তাহাকে কিছুটা সম্মান দেখায়, কাগজপত্র লেখায় মাঝে মাঝে। কিন্তু আসলে সে তো মণিমোহনের আর্দালী ছাড়া আর কিছুই নয়। উপরওয়ালা মনিবের চাল চলন লইয়া সে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করিতে যাইবে কী জন্য ?

তবু একটা জিনিষ বড় খচ্ খচ্ করিতেছে। হাজার লোক, হিন্দু ছেলে। মুরগী খাওয়াটা না হয় সমর্থন করা যাইতে পারে—পেটে গঙ্গাজল আছে, ওটা শুদ্ধ হইয়া যাইবেই। কিন্তু মুসলমানের রান্না ! সাতবার প্রায়শ্চিত্ত করিলেও পাপ হইতে আর নিষ্কৃতি নাই, নির্ঘাৎ ম্লেচ্ছলোক প্রাপ্তি।

বর্মীটা মিথ্যা বলিয়াছিল লিসিকে। ডি-সুজা কিন্তু মরে নাই।

ঝড়ের পর দিন সে ফিরিল গ্রামে। সমস্ত চর ইস্‌মাইলে হুলুস্থুল শুরু হইয়াছে। জোহানকে যেন খুন করিয়াছে কাহারা। আর লিসি? কোনোখানে তাহার এতটুকু স্বাক্ষর চিহ্ন ডি-সুজা খুঁজিয়া পাইল না—সে যেন ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গেই দিগন্তে গেছে বিলীন হইয়া।

ডি-সুজা ক্রমেই ক্লান্ত হইয়া উঠিতেছিল। আফিমের ব্যবসায়ে ইহাই অবশ্য তাহার প্রথম হাতে-খড়ি নয়। জীবনের ত্রিশটি বৎসর ইহারই মধ্যে কাটাইয়া দিল, নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার ঘাত-প্রতিঘাতে সে নিজেকে গড়িয়া তুলিয়াছে। এই সব ব্যাপার লইয়া যাহারা কারবার করে, সমাজে কেহই তাহারা সাধু অথবা সচ্চরিত্র নয়—সাধু সাজিবার ভান সে-ও করে না। বরং সাধুত্ব জিনিসটা যে ক্লীব ও দুর্বলের লক্ষণ, এটাও সে ভালো করিয়াই জানে।

প্রথম যৌবন।

কলিকাতায় কর্মক্ষেত্র করিয়া সে তখন পেটেণ্ট ঔষধের ব্যবসা চালাইতেছিল। ঔষধগুলি সেই সব জাতের—যে-সমস্ত রোগের নাম ভদ্রসমাজে কখনো করিতে নাই এবং ভদ্রসমাজই যাহাদের প্রধান খরিদ্দার। পত্রিকার পৃষ্ঠায় চটকদার বিজ্ঞাপনগুলি কয়েক বছর যেন ছপ্পর ফুঁড়িয়া টাকা বৃষ্টি করিয়া গেল। ইচ্ছা করিলেই ডি-সুজা তখন লাল হইয়া যাইতে পারিত। কিন্তু পারিল না। লাল দামী মদ এবং গড়ের মাঠের পাশে পাশে সন্ধ্যার সময় দরজা জানালা বন্ধ যে সব রহস্যময় ল্যাণ্ডো ঘুরিয়া বেড়াইত, তাহারাই সে ব্যাপারে বাদ সাধিল।

প্রতিযোগিতার বাজার। দেখিতে দেখিতে যত্রতত্র অসংখ্য ঔষধের কোম্পানী গড়িয়া উঠিল এবং তাহাদের প্রচণ্ড বিজ্ঞাপন কোলাহলে ডি-সুজার কণ্ঠস্বর চাপা পড়িয়া গেল। অতএব বাড়ীওয়ালাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া জাল গুটাইতে হইল। কিন্তু কেবল জাল গুটাইলেই তো চলে না, ব্যবসা উপলক্ষে যে অংশীদারটি প্রাণপণে তাহার জন্য ঢাক পিটাইতেছিল, তাহাকেও একেবারে বঞ্চিত করিলে ধর্মে সহিবে কেন? ডি-সুজা ধার্মিক লোক। সুতরাং একদিন প্রভাতে সমস্ত রাত্রির নেশা কাটাইয়া যখন তাহার সহকারী জার্ডিন উঠিয়া বসিল তখন তাহার রূপবতী স্ত্রী হিল্‌ডাকে এবং সেই সঙ্গে ঘরের বহু মূল্যবান জিনিসপত্র কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। বলা বাহুল্য, ডি-সুজাকে তো নয়ই!

সেই প্রথম হাতে খড়ি। তাহার পর কত হিল্‌ডা আসিল গেল। জীবন এবং জগৎটাকে আরো ভালো করিয়া জানিয়া নিবার জন্য সমস্ত ভারতবর্ষটাই পরিভ্রমণ করিল সে। সঙ্গী জুটিল যোগ্যতম ব্যক্তি—ডেভিড গঞ্জালেস্।

অর্থ-রোজগারের চেষ্টায় যে সব পথ তাহারা তখন ধরিয়াছিল, তাহার ইতিহাস প্রকাশ পাইলে তিরিশ বছর পরে আজো অনায়াসেই দ্বীপান্তর হইতে পারে। ডাকাতি, নোট-জাল, দ্রুতগামী মেল ট্রেনের কামরায় একাকিনী মহিলাযাত্রীকে আক্রমণ—সভ্যতার আলোকিত রঙ্গমঞ্চটার নেপথ্যে যে অন্ধকার অংশটা—সেখানকার কোনো গলিঘুঁজি চিনিয়া লইতেই তাহার বাকী নাই।

মাতাল অবস্থায় মোটর চাপা পড়িয়া মরিল ডেভিড। আর ডি-সুজা চট্টগ্রামের বন্দরে খালাসীদের কাছ হইতে বিপ্লববাদীদের জন্য রিভলভার সংগ্রহ করার ব্যাপারে এই নূতন পথটার সন্ধান পাইয়া গেল। যেমন

অল্প পরিশ্রম, তেমনই আয়। ঝক্কি অবশ্য আছেই, রোজগারের পথ কবে আর কুসুমাস্তৃত হইয়া থাকে ?

আজই না হয় চর ইসমাইলের বন্দর শোভায় সমৃদ্ধিতে ফাঁপিয়া উঠিতেছে, কিন্তু সেদিন কি এম্‌নি অবস্থা ছিল ? সেদিনও তেঁতুলিয়া এমন করিয়া নিজের বহিয়া-আনা পলি মাটিতে নিজেরই মৃত্যুশয্যা রচনা করে নাই। চৈত্রের অসহ্য রৌদ্রে যখন আকাশটায় শুষ্ক চিড় খাইবার উপক্রম করিত, তখনও এই নদীতে বাঁও মিলিবার কল্পনাই করিতে পারিত না কেউ। আর-এস-এন কোম্পানীর নূতন লাইনে তো দূরের কথা, জল-পুলিশের নৌকা তখন ভোলা বা চাঁদপুরের কূল ছাড়াইয়া এদিকে পাড়ি জমাইবার দুঃসাহসিক কল্পনাকে মনের কোণেও স্থান দিত না। ব্যবসার পক্ষে কী দিনগুলাই যে গিয়াছে।

তারপর তিরিশ বৎসর কাটিয়া গেল—সম্পূর্ণ তিরিশটা বৎসর ! নদীতে চড়া পড়িল, পড়িল মানুষের মনেও। সেই দুঃসাহসিক ডি-সুজার প্রখর রক্তধারাও মন্থর হইয়া আসিল বুঝি। কয়দিন হইতেই ভয় করিতেছে। নিজের সুদীর্ঘ জীবনে পাশবিকতা আর বিশ্বাসঘাতকতার এত দৃষ্টান্তের সহিত তাহাকে মুখোমুখি করিতে হইয়াছে যে সাপের চাইতেও মানুষ নামক জীবটিকে সে অবিশ্বাস করে বেশি।

লিসির সম্পর্কে বর্মীটার মনোভাব কী কে জানে ? হয় তো ভালোই —কিন্তু বহুদিন পরে ডি-সুজার কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ হইতেছে এ পথে প্রথম নামিবার সময় যেমনটা হইয়াছিল তেমনিই। এই যে এতগুলি টাকা সে জমাইয়াছে বা জমাইতেছে এ কেবল লিসির জন্যেই তো। কিন্তু ইহার জন্য শেষ পর্যন্ত লিসিকেই যদি হারাইতে হয়, তাহা হইলে—

নাঃ, এ সবের কোনো অর্থ হয় না। নিজেই কি পরোয়া রাখে কাহারো? বয়স হইয়াছে—তা হোক, বর্মীর চাইতে তাহার পর্তুগীজ বাহুতে কিছু কম শক্তি ধরে না। তেমন তেমন ঘটিলে সে-ও তাহার মহড়া লইতে জানে। আর টাকা? টাকা যে কাহারো বেশি হয় এ কথা কেউ কখনো শুনিয়াছে নাকি? সারাজীবন ভরিয়া উপবাসী থাকিয়া জমাইয়া যাও—ঘোড়-দৌড়ের মাঠে তিনটা দিন বাজী ধরিয়াই একদম ফতুর। নিজের চোখেই তো এ সব সে কতবার দেখিল।

কাজেই সন্ধ্যার মুখে ভাঙা-গীর্জাটার তলা হইতে ডিঙি খুলিয়া দিতে হইল। আগে হইলে কি এত সব বালাই ছিল নাকি! দিনকাল এখন সত্যিই খারাপ পড়িয়াছে। শুধু খারাপ বলিলেই যথেষ্ট হয় না—যতদূর খারাপ হইতে হয়। এমন দিনও গিয়াছে যখন প্রকাশ্যে হাটে বসিয়া—হাঁ, এই গাজীতলার হাটে বসিয়াই দাঁড়ি পাল্লা দিয়া কালো খয়েরের সঙ্গে আফিং বিক্রী করিয়াছে ডি-সুজা। তখনকার দিনে তো সে এ তল্লাটে একরকম রাজত্বই করিত বলা চলে।

কিন্তু সে-সব এখন নিতান্তই স্বপ্ন-কল্পনা। আবগারী লোকের জ্বালায় এখন আর কোনোদিক সামলাইবার জো নাই। গ্রামে গ্রামে, হাটে বাজারে তাহাদের লোক নিতান্ত নিরীহ ভালো মানুষটির মতো ঘুরিয়া বেড়ায়, খোঁজ-খবর সংগ্রহ করে। তারপর কিছু সূত্র সংগ্রহ করিতে পারিলেই গলাটি টিপিয়া ধরিতে যা দেরী। এই তো সেদিন খোকা মিঞার পাঁচটি বৎসর শ্রীঘর হইয়া গেছে।

ডি-সুজা ধীরে ধীরে দাঁড় টানিতে লাগিল, কিন্তু টানিবার দরকার ছিল না কিছু। ভাঁটার মুখে নোনাজল খরস্রোতে নামিয়া চলিয়াছে

তর্ তর্ করিয়া। নারিকেল বনের মাথায় জাগ্রৎ একখণ্ড চাঁদ হইতে বুনো-হাঁসের পাখার মতো নদীর জলে আলো-অন্ধকারের বিচিত্র রঙ ছড়াইয়া পড়িতেছে। গাজীতলার হাট পার হইলেই মুসলমানদের বস্তি, ছোট ছোট ঘরগুলি বাগানের আড়ালে আড়ালে একেবারে জলের ধার অবধি নামিয়া আসিয়াছে, আর তাহারই কোল ঘেঁষিয়া চলিতেছে নৌকা। নিবিড় দীর্ঘ ঘাসের বন সমস্ত তীরভূমিটাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, ইচ্ছা করিয়াই এ দেশের লোক বাড়িতে দিয়াছে ওদের। ঝড়-তুফান কিংবা জোয়ারের সময় যখন বড় বড় ফেনার মুকুট-পরা ঢেউ আসিয়া কূলকে আঘাত করিতে চায়, তখন এই ঘাসগুলিই বুক পাতিয়া সর্বপ্রথমে সে আঘাত গ্রহণ করে, ডাঙা পর্যন্ত পৌঁছিতে দেয় না। এই ঘাসবন ভাঙিয়া ডিঙিটা খস খস করিয়া আগাইয়া চলিয়াছে। কী একটা ছোট মাছ অন্ধের মতো লাফাইয়া উঠিয়া ছলাৎ শব্দে একেবারে আসিয়া পড়িল নৌকার খোলের মধ্যেই।

গলুইয়ের উপর অলস-ভাবে গা এলাইয়া দিয়া বর্মীটা সিগারেট টানিতেছে। অনুজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় তাহাকে ভালো করিয়া যেন চেনা যাইতেছে না। ডি-সুজার মনে হইতে লাগিল: ম্লান জ্যোৎস্নার আলোয় সমস্ত দিগ্‌দিগন্ত যেন অদ্ভুতভাবে রহস্যময়—আশে পাশে কী আছে এবং কী যে নাই—দূরের তটরেখা যেমন সম্ভব-অসম্ভবের অসংখ্য ছায়ামূর্তি রচনা করিয়া একটি অজ্ঞাত জগতের রূপ লইয়া বসিয়া আছে—বর্মীর সঙ্গে ইহাদের সব কিছুরই কী একটা সামঞ্জস্য আছে হয় তো। পুরানো-হইয়া-আসা হাতীর দাঁতের মতো তাহার মুখের রঙ—সিগারেটের আলোয় থাকিয়া থাকিয়া সেই মুখটা আভাসিত হইয়া উঠিতেছে।

অস্বস্তি লাগিতেছিল। নীরবতাটা যেন পীড়িত করিতেছে ডি-সুজাকে। কিছু একটা বলিবার জন্যই সে জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের আসামের খবর কী?

অনাসক্ত গলায় জবাব আসিল, খুব খারাপ।

—খুব খারাপ? কেন?

—পার্বতীপুরের রেল-ইস্টিশনে তিনজনকে ধরে ফেলেছে। সাত-আট হাজার টাকাই জলে গেল। ওদিকের ও পথটায় আর সুবিধে হবে না মনে হচ্ছে।

ডি-সুজা ভীত হইয়া উঠিতেছিল।

—বলো কী! আসামের কাজ বন্ধ হয়ে গেলে তো সবই গেল।

—প্রায় গেলই তো। এদিকেও পুলিশ খুব জোর দেবে বোধ হচ্ছে। যতটা সম্ভব সাবধান হয়ে থেকো, কোনরকম কিছু আঁচ না পায়।

ভয়টা মনের ভিতর হইতে আবার ঠেলিয়া উঠিতেছে। গঞ্জালেস্ কবে আসিবে কে জানে। জোহানকে আর বিশ্বাস নাই, সবই যখন জানিয়া ফেলিয়াছে, তখন যে সময় যা ইচ্ছা তাই সে অনায়াসে করিয়া বসিতে পারে।

উত্তেজিতভাবে ডি-সুজা বলিয়া ফেলিল, যথেষ্ট হয়েছে, এবার আমাকে ছেড়ে দাও তোমরা। আমি আর এসব গোলমালের মধ্যে থাকতে চাই না।

মুখ হইতে সিগারেট নামাইয়া বর্মী উঠিয়া বসিল। সে যে খুব বিস্মিত হইয়াছে মনে হইল না, যেন এমন একটা কথার জন্যই সে এতক্ষণ প্রতীক্ষা করিতেছিল। সংক্ষেপে বলিল, তুমি তো পর্তুগীজ।

তোমার পূর্বপুরুষেরা সারা দুনিয়া লুঠতরাজ করে বেড়াত—সুন্দরী মেয়েমানুষ পেলেই ছিনিয়ে নিয়ে আসত, তাদের বংশধর হয়ে তোমার এত ভয় কিসের ?

পূর্বপুরুষদের গৌরবময় কীর্তিকলাপ স্মরণ করাইয়া দিয়া তাহাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবার মতো কথার সুরটা তাহার নয় ; বরং ইহার মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্ট এবং তীক্ষ্ণ একটা খোঁচা আছে। বহুদিন ধরিয়াই ডি-সুজা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে, শাদা জাতিগুলির উপর ইহার অতি-প্রকট খানিকটা ঘৃণা যখন তখন আত্মপ্রকাশ করিয়া বসে। হয় তো স্বাধীন ব্রহ্মের স্মৃতিটা এখনো ভুলিতে পারে নাই ; শৃঙ্খল গ্রহণ করিয়াছ বটে, কিন্তু মান্দালয়ের রাজশক্তি যে আবার একদিন জাগিয়া উঠিবে গৌরবের পূর্ণ রূপ লইয়া—একথা ইহারা আজও বিশ্বাস করে হয় তো। তাই শ্বেত জাতিগুলি ইহাদের ঘৃণার বস্তু। একদিন—এবং সে তো আর খুব বেশিদিন আগেই নয়—ভারতবর্ষের কূল উপকূল ঘিরিয়া তাহার পূর্বপুরুষেরা যে ভাবে অত্যাচারের আগুন জ্বালাইয়াছিল, বিবাহের রাত্রে চন্দন-চর্চিতা কন্যাকে যে ভাবে ছিনাইয়া আনিয়া বজরার অন্ধকারে রাক্ষসমতে নিজেদের অঙ্কশায়িনী করিয়াছিল, গর্বোজ্জ্বল এই সমস্ত কাহিনী শুনিয়া ওর চোখ প্রশংসায় উজ্জ্বল হইয়া ওঠে না ; হাতীর দাঁত যেন কালো হইবার উপক্রম করে গ্র্যানাইটের মতো। ডি-সুজার মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, ভারতবর্ষের উপর এই হলুদে মানুষটির বেশ খানিকটা তীব্র সহানুভূতি জাগিয়া আছে হয় তো।

তিক্তভাবে ডি-সুজা কহিল, ভয় নয়। বুড়ো হয়ে গেছি, শরীরে এখন আর এসব পোষায় না। আর যে কটা দিন বাঁচব, কোনো ঝক্কির ভেতরে থাকতে চাই না।

সিগারেটটাকে জলে ফেলিয়া দিল বর্মী। আস্তে আস্তে বলিল, সে একটা কথা বটে। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে এই যে, এ পথে ঢোকা সহজ, কিন্তু বেরোনো সহজ নয়। তাই যতদিন বাঁচবে, ততদিন এই কাজই করে যেতে হবে তোমাকে। আজ দলের থেকে বেরিয়ে গিয়ে কালই যে তুমি সবাইকে ধরিয়ে দেবে না—তার কোনো প্রমাণ আছে ?

ডি-সুজা ম্লান হইয়া গেল।

—আমাকে বিশ্বাস করো না তোমরা ?

একটু হাসিল সে। তারপর আবার আধশোয়ার ভঙ্গিতে গলুইয়ে গা এলাইয়া দিয়া জবাব দিল, বিশ্বাস করা কি এতই সহজ ?

ডি-সুজা চুপ করিয়া রহিল। সত্যিই বিশ্বাস করা সহজ নয়। অবিশ্বাস, মিথ্যা আর অন্যায় লইয়াই যে ত্রিশ বৎসর ধরিয়া কারবার চালাইল, বুড়ো বয়েসে দলকে দল ধরাইয়া দিয়া সে যে মোটারকম একটা কিছু পাইবার প্রত্যাশা করিবে সেটা তাহার পক্ষে কিছু অস্বাভাবিক হয় না। ঠিকই বলিয়াছে, রাগ করিয়া লাভ নাই।

নারিকেল বনের চূড়ায় খণ্ড চাঁদ। ডি-সুজা অন্যমনস্কের মতো দাঁড় টানিয়া চলিল। কিন্তু ইহারই মধ্যে হঠাৎ খানিকটা ঢোল ও করতালের শব্দ উঠিয়া মথিত করিয়া দিল আকাশকে। দূরে নদীর মাঝখানে নূতন জাগা ছোট বালুচরটার উপরে নোঙর ফেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে একখানা বড় নৌকা। ঘোলাটে জ্যোৎস্নাতেও দেখা যায়, তাহার দুদিকে ছোট ছোট দুটি পতাকা উড়িতেছে ; দুই-একটা আলো জ্বলিতেছে মিট মিট করিয়া, আর তাহারই সঙ্গে সঙ্গে ঝমর্ ঝমর্ করিয়া বাজনা বাজিতেছে।

সজোরে দাঁড়ে কয়েকটা টান দিয়া ডি-সুজা নৌকাখানাকে আনিয়া ফেলিল একেবারে কূলের কাছে। ঝোপ-জঙ্গলের এলোমেলো ছায়ায়

জ্যোৎস্না এখানে তেমন স্পষ্ট হইয়া পড়ে নাই। তাহারই আড়ালে নৌকা বাহিতে বাহিতে ডি-সুজা বলিল, জলপুলিশ!

—জলপুলিশ! বর্মী সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল।

ডি-সুজা বলিল, ভয় নেই, আমাদের ধরবার জন্যে নয়। এখানে কয়েকদিন আগে মস্ত একটা ডাকাতি হয়ে গেছে, তারই খোঁজ-খবর নিতে এসেছে ওরা।

—ডাকাতি? কারা করেছে?

—কারা করবে আর? আমাদের গাজী সাহেবের দল নিশ্চয়ই।

—চালাক লোক গাজী সাহেব। এদিকে ত ঢের জমিদারী আছে, আফিঙের কাজেও রোজগার একেবারে মন্দ হয় না, আবার ডাকাতির ব্যবসাও চলেছে বেশ।

জলপুলিশের নৌকাটা ডি-সুজার মনটাকে বদলাইয়া দিয়াছে আকস্মিকভাবে। বর্মীটাকে যেন এই মুহূর্তে আর ততটা খারাপ বলিয়া বোধ হইল না। দুঃসাহসিক—বেপরোয়া ডি-সুজা। জীবন ভরিয়া কীই না করিল সে। আজই না হয় খুনাখুনির ব্যাপারে চিত্তটা চমকিয়া ওঠে—পুলিশের নামে তটস্থ হইয়া ওঠে সর্বাঙ্গ, কিন্তু কর্মমাতাল জীবনে যেদিন জোয়ার আসিয়াছিল, সেদিন মৃত্যুর চাইতে সহজ আর কিছু আছে বলিয়াই মনে হয় নাই। আম্বালা স্টেশনের সেই শিখ স্টেশন-মাস্টারটার কথা মনে পড়িতেছে। ডেভিডের কুড়ুলের একটি কোপে তাহার মাথার গোলাপী পাগড়ি উড়িয়া পড়িয়াছিল—আর খুলিটা চুরমার হইয়া রক্ত আর ঘীলু ছিটকাইয়া দেওয়ালে গিয়া লাগিয়াছিল। ফিন্‌কি দিয়া খানিকটা গরম রক্ত আসিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছিল ডি-সুজার নাকে মুখে।

ডি-সুজা নড়িয়া চড়িয়া ঠিক হইয়া বসিল। একটু আগেই কী দুর্বলতা যে পীড়িত করিতেছিল তাহাকে। লোকটাকে এমন অবিশ্বাস করিবার কী আছে! এতদিন ধরিয়াই ত লিসিকে দেখিয়া আসিতেছে সে। কিছু একটা করিবার মতলব থাকিলে কি এর মধ্যেই করিতে পারিত না?

বর্মীর কথার কোনো স্পষ্ট উত্তর না দিয়া ডি-সুজা নীরবে দাঁড় টানিতে লাগিল। জলপুলিশদের নৌকাটা একেবারে কাছে আসিয়া পড়িয়াছে, হোগ্‌লাবন ঘেঁষিয়া অত্যন্ত সাবধানে চলিল ডিঙিটা। আফিঙের বাণ্ডিলটাও সঙ্গেই আছে। চ্যালেঞ্জ করিলে কেবল যে হাতে দড়ি পড়িবে তাই নয়, অনেকগুলা টাকাই বরবাদ হইয়া যাইবে একেবারে।

জলপুলিশের তখন এদিকে ভ্রূক্ষেপ করিবার মতো মনের অবস্থা নয়। নিরালা নদীর বুকে বসন্তের রাত্রি। বাতাসে বাতাসে স্নিগ্ধ পেলবতা। দূর পশ্চিম হইতে বাংলা দেশের এই প্রত্যন্ত সীমায় এমন অপূর্ব পরিবেশের মধ্যে আসিয়া রীতিমতো রঙীন হইয়া উঠিয়াছে তাহাদের মন। যুক্ত-প্রদেশের কোন্ এক অখ্যাত পল্লীগ্রামে সর্বাঙ্গে রূপার গয়না পরিয়া যেখানে তাহার প্রেয়সীরা ঘর্ ঘর্ করিয়া জাঁতায় গম ভাঙিতেছে, সেখানকার স্মৃতি মানসচক্ষের সাম্‌নে ভাসিয়া উঠিয়া তাহাদের উদাস করিয়া দিতেছে। একজন দস্তুর মতো গান জুড়িয়া দিয়াছে:

“আরে সাত সমুন্দর পার পিয়া বাসে
আহা আওনে মেরা পাস্ তাকত্ নেহি—”

সঙ্গে সঙ্গে ঢোল এবং করতালও চলিতেছে সমান উৎসাহে। বোঝা যাইতেছে, সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে যে প্রেয়সীটি বিদ্যমান আছে

এবং যাহার বিরহে গায়কের বিক্ষোভের সীমা নাই—সে প্রেয়সীটির সম্বন্ধে কেহই নিতান্ত উদাসীন নয়। ঢোলকের উপর যেভাবে উদ্দাম আক্রমণ চলিতেছিল, তাহাতেই সেটা বোঝা যাইতেছিল।

নীরবে খানিকটা পথ পার হইয়া গান ও করতালের শব্দটা যখন ক্ষীণ হইয়া আসিল তখন বর্মী প্রশ্ন করিল, আর কতটা যেতে হবে?

ডি-সুজা জবাব দিল, দূর আছে। সামনের অন্ধকারে ওই যে কালো বাঁকটা—ওটা পেরোলে আরো প্রায় এক কোশ।

—গাজী সাহেব কী বলে আজকাল?

—কোকেনের কথা বলছিল। বলছিল, কিছু কোকেন আনাতে পারলে সুবিধে হয়।

বর্মী হাসিল: খাঁই আর মিটছে না। ডাকাতির ব্যবসাও তো চলছে।

—তা চলছে! গাজী মানুষ কিনা, তাই রক্তের থেকে লড়াইয়ের নেশা আজো মেটে নি।

—গাজীরা কি লড়ায়ে জাত নাকি?

—তা বই কি। গাজী মানেই তো তাই। যুদ্ধ আর ধর্ম-প্রচার একসঙ্গে যারা করে তারাই গাজী।

বর্মী হালকাভাবে একটা মন্তব্য করিল, সেইজন্যেই শাদা জাতের সঙ্গে তাদের এতটা মেলে বোধ হয়।

কথাটা অনাবশ্যকভাবে টানিয়া আনা—ডি-সুজা আবার গম্ভীর হইয়া গেল। আলো-আঁধারে মিশানো এই বিচিত্র কালো রাত্রির তলায় কেমন যেন মনে হইতেছে লোকটাকে। এই রাত্রিকে, এই মুহূর্তকে যেন বিশ্বাস করা চলে না। বাতাসের ছন্দটা অত্যন্ত লঘু, যেন অস্ফুট ভাষায়

কী একটা কথা ক্রমাগত বলিয়া চলিয়াছে। চিত্র-বিচিত্র পাখা মেলিয়া বুনো হাঁসের মতো নদীর জল ভাঁটার মুখে সমুদ্রের নীড়ে চলিয়াছে বিশ্রামের সন্ধানে। দাঁড়ের মুখে জল ভাঙিয়া লবণ মিশানো ফস্‌ফরাস্‌ থাকিয়া থাকিয়া চিক্‌ চিক্‌ করিয়া উঠিতেছে। এমন একটি রাত্রে—এমন একটি মুহূর্তে কত কী যেন অঘটন ঘটিতে পারে। ডি-সুজা মাথার উপরে আকাশের দিকে তাকাইল—নিশি-সমুদ্রে স্নান করিয়া অত্যন্ত উজ্জ্বলভাবে তারাগুলি দপ্‌ দপ্‌ করিতেছে। অন্তত বারোটার কম হইবে না। রাত্রির প্রহরী কাল-পুরুষ যেন সজাগ সতর্ক চোখ মেলিয়া চাহিয়া আছে আকাশে-অরণ্যে জলে-স্থলে একাকার স্বপ্নাচ্ছন্ন পৃথিবীর দিকে।

বর্মী আবার একটা সিগারেট ধরাইল। কাজের লোক সে। এলোমেলো চিন্তা মনের মধ্যে একের পর একে আসিয়া ভিড় করিতেছে। কালই নৌকা ছাড়িয়া হয় তো বা যাত্রা করিতে হইবে আকিয়াবের পথে। এদিককার ব্যবস্থা দিনের পর দিন জটিল হইয়া উঠিতেছে—আর বেশিদিন এখানে কাজ চালাইলে সব মাটি হইয়া যাওয়া আশ্চর্য নয়। নুরুল গাজী অত্যন্ত হুঁশিয়ার ও স্বার্থপর—তাহাকে কোনোদিনই বিশ্বাস করা যায় নাই। ডি-সুজা কাজের লোক, কিন্তু বয়স হইয়াছে, অনেক দিক দিয়া সে পড়িয়াছে পিছাইয়া। এখন তাহাকে রাখাও যায় না, ছাড়াও যায় না। এ অবস্থায়—

এ অবস্থায় যা করা যাইতে পারে সে তাহা আগেই ভাবিয়া রাখিয়াছে। কাজটা নানাদিক দিয়া তেমন ভালো হয় তো দেখাইবে না, কিন্তু এ ছাড়া উপায় নাই আর। তা ছাড়া এই পর্তুগীজের দল। সিবাস্টিয়ান গঞ্জালেস্‌ই যাহাদের আদর্শ পুরুষ, নৃশংসতাই যাহাদের

বীরকীর্তির চরম নিদর্শন, তাহাদের সঙ্গে এ ছাড়া আর কী করা যাইতে পারে ? শুধু পর্তুগীজ কেন, যে কোনো শ্বেত জাতিকেই যে সে সত্যি সত্যি দেখিতে পারে না, এ কথা তো আর অস্বীকার করা চলে না।

নৌকা চলিয়াছে। বৈশাখা নদী—চেহারায় কৃশতা আসিলেও টের পাইবার জো নাই এর রাত্রিতে। তবু যে রূপটা তাহার এই আলো অন্ধকারে অতি বিচিত্র ও অতি বিশাল বলিয়া বোধ হইতেছে সে রূপটা পুরাপুরি সত্য নয়। নদীর অনেকটা ভিতর দিয়াই নৌকা চলিতেছে। তবু যে তলায় খস্ খস্ শব্দ করিয়া বালি বাজিতেছে সেটা টের পাওয়া গেল। চর জাগিতেছে। দাঁড়ে বালি ঠেলিতে ঠেলিতে ডি-সুজা নৌকাটাকে একপাশে বেশি জলের মধ্যে নামাইয়া আনিল।

চর জাগিতেছে। ঠিক এবারে নয়—দু-এক বছরের মধ্যেই তাহার সম্পূর্ণ চেহারাটা জলরেখার উপরে বেশ খানিকটা ঠেলিয়া উঠিবে—এমনি একটা অনুজ্জ্বল জ্যোৎস্না রাত্রিতে দূর হইতে তাহাকে দেখাইবে একটা উবুড় করা অতিকায় জেলে-ডিঙির মতো। তারপরেই আবার চলিবে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। নূতন উপনিবেশ—নূতন মানুষ। নব নব বর্বরতা—আদিমতার প্রায়ান্ধকারে সৃষ্টি-শতদলের প্রথম উন্মেষ। সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ, ঘাত-প্রতিঘাতের নানা তরঙ্গে উপনিবেশ সার্থক হইবে. সেদিন আবার আসিবে তাহাকে লইয়া কাহিনী রচনার অবকাশ।

বর্মী কথা কহিল। হঠাৎ কেমন করিয়া তাহার স্বর বদলাইয়া গেছে অনেকটা। ঠিক বদলাইয়া গেছে বলা চলে না—তাহার অনাসক্ত নির্লিপ্ত কণ্ঠস্বরে কিছুটা অনুভূতির ছোপ ধরিয়াছে যেন। শব্দের যদি রঙ থাকিত, তাহা হইলে বলা যাইত কালো রঙ ; অথবা চর ইস্মাইলের

দিগন্তে বৈশাখের যে আসন্ন-প্রলয় মেঘচ্ছবি ফুটিয়া ওঠে তাহার রঙ। সে কহিল, পথ আর কতটা ?

ডি-সুজা তখন তীরের দিকে পাড়ি ধরিয়াছে। দাঁড়ের টানে টানে ফস্‌ফরাস্‌ মিশানো জলে যেন লক্ষ লক্ষ জেনাকির অগ্নিবিন্দু জ্বলিতেছে। নারিকেল বনের মাথায় চাঁদের মুখের উপর একরাশ মেঘ বেশ খানিকটা আবরণ বিছাইয়া দিয়াছে। তীরের জঙ্গলগুলি দেখিলে এখন হয় তো বা হঠাৎ মনে হইতে পারে সারি সারি ঝাঁকড়া মাথা লইয়া অন্ধকারের মধ্যে বসিয়া আছে কাহারা—আর অসংখ্য জোনাকি পিট্‌ পিট্‌ করিতেছে তাহাদের রাশি রাশি চোখের মতো : ঠিক সেই সব চোখের মতো—পাথরের মতো ছিদ্রহীন আর জমাট রাত্রিতে যাহারা বত্রিশ দাঁড়ের ছিপ লইয়া সমুদ্রের কালো মোহানায় শিকারের সন্ধান করিয়া বেড়ায়।

ডি-সুজার আবার ভয় করিতেছে। অথচ ভয়টা অর্থহীন—সম্পূর্ণই অর্থহীন। তবুও এই রাত্রি। এমন রাত্রিকে বিশ্বাস করা চলে না।

কিন্তু ভরসা এই, পথটা ফুরাইয়াছে এতক্ষণ।

ডি-সুজা বলিল, এসে পড়েছি প্রায়।

বর্মী চুপ করিয়া রহিল।

নৌকা খালের মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। এই খালে লগি ঠেলিয়া আরো খানিকটা পথ। কচুরিপানা খালের বুক জুড়িয়া ঘন হইবার উপক্রম করিতেছে। এই নোনার দেশে আসিয়াও তাহাদের জীবনীশক্তিতে এতটুকু নোনা ধরে নাই—বংশ-বিস্তৃতি চলিতেছে অপ্রতিহতভাবে। এমন একদিন হয় তো আসিবে যখন সমস্ত বঙ্গোপসাগর জুড়িয়া কচুরিপানার দুর্ভেদ্য আবরণ পড়িবে—আর হাজার হাজার মাইল জুড়িয়া বেগুনি ফুলগুলি হাওয়ায় হাওয়ায় মাথা দুলাইবে।

কচুরি বন ভাঙিয়া আগাইয়া চলিয়াছে নৌকা। খস্‌-খস্‌-খস্‌। কেমন একটা শব্দ—কানের মধ্যে শির শির করিতে থাকে। হঠাৎ নৌকাটা কিসে আট্‌কাইয়া গেল। তলা হইতে বিশ্রী দুর্গন্ধের একটা প্রবল উচ্ছ্বাস উঠিয়াছে। কোনো কিছুর একটা মড়া লাগিয়াছে নিশ্চয়ই।

টর্চের আলো ফেলিল বর্মী। মড়াই বটে। ফুলিয়া অস্বাভাবিক রকমের শাদা প্রকাণ্ড একটা ঢোলের মতো দেখাইতেছে। পেটে মাংস কাহারা খুবলাইয়া খুবলাইয়া খাইয়াছে বলিয়া মনে হয়, কালো একরাশ নাড়ীভুঁড়ি দুইপাশে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। এক মাথা চুল জলে ভাসিতেছে—তরুণী স্ত্রীলোকের দেহ। নারী-ঘটিত আসক্তি হইতে মুক্তি লইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে চায় যাহারা—এই নগ্ন বিকৃত দেহটাকে একবার দেখিলেই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট।

শিহরিয়া সে টর্চটা নিবাইয়া দিল। অন্ধকারের মধ্যে দুর্গন্ধটা যেন পুরু ক্যানভাসের পর্দার মতো জুড়িয়া আছে। জোরে জোরে লগি ঠেলিয়া ডি-সুজা জায়গাটা পার হইয়া গেল। একটু দূরেই ঝোপের মধ্যে হঠাৎ আলো জ্বলিয়াই নিবিয়া গেল—আলেয়া? যে শেয়ালগুলি এতক্ষণ বসিয়া বসিয়া মড়া খাইতেছিল তাহারাই কি হাই তুলিতেছে? এ দেশের লোক হইলে নিশ্চয় মনে করিত পেত্নী। অথবা সেই তাহারা—যাহাদের মাথা নাই অথচ ঘাড়ের উপর দুইটা বড় বড় চোখ ভাঁটার মতো জ্বলিতেছে; অন্ধকারে পঞ্চাশগজী দুইটা হাত দুই দিকে প্রসারিত করিয়া যারা জীবজন্তু হাতড়াইয়া বেড়ায়।

শেয়ালের কোলাহল শোনা গেল। মড়াটাকে লইয়া নিশ্চয়ই। ওই মড়াটা বর্মীর সমস্ত দ্বিধা-সংশয়কে যেন সমতল করিয়া দিয়াছে।

গাজীকে বিশ্বাস করা আর নিরাপদ নয়। ডি-সুজার প্রয়োজন ফুরাইয়াছে—তা ছাড়া লিসি! পর্তুগীজদের ঘৃণা করা যাইতে পারে, তাই বলিয়া তাহাদের মেয়েদেরও যে ঘৃণা করিতে হইবে তাহার কী মানে আছে। সিবাস্টিয়ান গঞ্জালেস্‌ও তো জেণ্টুরদের ঘৃণা করিত—কিন্তু তাহাদের সুন্দরী মেয়েদের উপর তাহার আসক্তিও কিছুমাত্র কম ছিল না।

গাছপালার ঘন অন্ধকার। কচুরিপানা ঠেলিয়া একঘেয়ে শির শির শব্দে চলিয়াছে নৌকাটা। অন্ধকারে কাহারো মুখ দেখা যায় না। চকিত পোকামাকড়ের দল উড়িয়া নৌকায় আসিয়া পড়িতেছে।

কাঠ-ফেলা বড় একটা ঘাটের গায়ে ডি-সুজা নৌকাটাকে ভিড়াইয়া দিল। কহিল, এসে পড়েছি।

নুরুল গাজী তাহাদের জন্য প্রতীক্ষাই করিতেছিলেন।

বাহিরের একটা ঘরে মিট্‌ মিট্‌ করিয়া একটা দেশী চৌকোণা লণ্ঠন জ্বলিতেছে। অনুজ্জ্বল রক্তাভ আলো, ঘরময় পোড়া কেরোসিনের গন্ধ ভাসিতেছে। টিনের চালে সুপারির আড়া হইতে কালো কালো একরাশ ঝুল দুলিতেছে ঝালরের মতো। আর নিচে একখানা মাদুর পাতিয়া কী যেন পড়িতেছেন গাজী সাহেব—রীতিমতো সুর করিয়াই।

ডি-সুজা এবং বর্মীটি ঘরে ঢুকিতেই গাজী সাহেব সাদরে তাহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। ফকিরের মতো চেহারা। শাদা দাড়ি বুক অবধি ঝুলিয়া পড়িয়াছে সুদীর্ঘ চামরের মতো। পাকা গোঁফ দাড়ির দুইটি সীমান্ত-রেখা তামাকের রঙে অনুরঞ্জিত। গলাতে কাচ এবং কড়িতে মিশানো দুই ছড়া মালা—থাকিয়া থাকিয়া খট্‌ খট্‌ শব্দে বাজিয়া ওঠে।

হাত দুটি সামনে বাড়াইয়া দিয়া গাজী সাহেব বলিলেন, এসো, এসো। তোমাদের জন্যই বসেছিলাম।

দুজনে মাদুরে আসিয়া বসিল। গাজী সাহেব শশব্যস্তে তাহাদের দিকে গোটা দুই তাকিয়া আগাইয়া দিলেন। তারপর ডাকিলেন, আবদুল্লা!

মালকোঁচা করিয়া লুঙ্গি পরা একটা ছোকরা চাকর তন্দ্রাজড়িত চোখ লইয়া দেখা দিল।

—জী!

—তামাক।

এক কোণে একটা গড়গড়া হইতে কল্‌কেটা তুলিয়া লইয়া আবদুল্লা বাহির হইয়া গেল।

গাজী সাহেব হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মাল কতটা?

—পাঁচ সের।

—পাঁচ সের? বড্ড কম। গাজী সাহেবের স্বরে নৈরাশ্য প্রকাশ পাইল।

বর্মী সামান্য একটু ভ্রূকুটি করিল, কী করা যাবে? বাজার বড় গরম। এমন যদি চলে তো এদিকের সব কাজ-কারবার তুলে দিতে হবে। পথে জলপুলিস দেখে এলাম।

—জলপুলিস? গাজী সাহেব একটু হাসিলেন। ভালো করিয়া তাকাইলে দেখা যায়, গাজী সাহেবের চোখ দুইটা ঠিক কালো নয়। কিছুটা নীল্‌চে, কিছু পিঙ্গল—যেন বিড়ালের চোখ। হাসির ছন্দে সেই নীলাভ-পিঙ্গল চোখ দুটি চিক্‌ চিক্‌ করিয়া উঠিল একটু।

—জলপুলিসের ভয় কিছু নেই। ওরা হাতের লোক—খাইয়ে-দাইয়ে মোটা করে দিয়েছি। নেমকহারামী বোধ হয় করবে না। তবে—

ডি-সুজা বলিল, আবগারী ?

গাজী সাহেব কহিলেন, তাই ভাবছি। এখানে সুলেমান বলে একটা লোক আছে, তার চাল-চলন সুবিধে বোধ হচ্ছে না। ও লোকটা বোধ হয় খোঁজখবর দেয়। ভালোমত একটা হদিস একবার পেলে হয়, তারপর ধরে ঠিক জবাই করে দেব।

এরা দুইজনে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইল একবার। প্রায় এক সঙ্গেই জোহানের কথা মনের সামনে ভাসিয়া উঠিয়াছে তাহাদের। জবাই ! বর্মী নীচের ঠোঁটটাকে কামড়াইল শুধু।

আবদুল্লা ফুঁ দিতে দিতে কল্‌কেটা লইয়া আসিল, তারপর সেটাকে গড়-গড়ার মাথায় বসাইয়া একেবারে সভার মাঝখানে আনিয়া রাখিল। বর্মী গড়গড়াটা নিজের দিকে টানিয়া আনিয়া কাঠের নলটায় মৃদু মৃদু টান দিতে শুরু করিল। কী একটা ভাবনায় চোখ দুইটা মুখর হইয়া উঠিয়াছে তাহার।

আফিঙের বাণ্ডিলটা বারকয়েক নাড়াচাড়া করিয়া গাজী সাহেব সেটাকে তুলিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন, তারপর খানকয়েক নোট আনিয়া তাহাদের সামনে রাখিলেন। বারকয়েক গণিয়া বিনাবাক্যব্যয়ে বর্মী সেগুলিকে ট্রাউজারের পকেটস্থ করিল।

গড়গড়াটা অধিকার করিয়া গাজী সাহেব বলিলেন, আমি ভাবছিলাম কিছু কোকেনের কথা। কলকাতা থেকে আমাদের যে লোক এসেছে সে বলছিল চালাতে পারবে।

বর্মী জিজ্ঞাসা করিল, সে লোক আছে এখানে ?

—আছে। ডাকব তাকে ? আবদুল্লা !

আবদুল্লা তন্দ্রাজড়িত চোখ লইয়া আবার দেখা দিল। মুখের ভাবে স্পষ্ট অপ্রসন্নতা। সারা রাত কি তাহাকে ঘুমাইতে দিবে না এরা ?

—ইয়াসিন, ইয়াসিন কোথায় রে ?

—গণিমিঞার বাড়িতে।

—গণিমিঞার বাড়িতে! গাজী সাহেব ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন, বলিলেন, আর মোতালেব ?

—সেও।

—বুঝেছি। গাঁজী সাহেব উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আবদুল্লাও মৃদু হাসিল।

ডি-সুজা প্রশ্ন করিল, কী হয়েছে ?

—আর বলো কেন সাহেব! কোত্থেকে একটা জেলের মেয়ে নিয়ে এসেছে, তাকে নিয়ে রেখেছে গণিমিঞার বাড়িতে। তাই—কথাটা অসমাপ্ত রাখিয়া গাজী সাহেব আবার হাসিলেন।

আবদুল্লা লোভীর মতো ঠোঁট চাটিল। বলিল, খুব মৌজ হচ্ছে এখানে। আমি মালিকের হুকুম পেলাম না, নইলে—সক্ষোভে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া আবদুল্লা চুপ করিল, অত্যন্ত ক্ষুধার্ত মনে হইল তাহাকে।

গাজী সাহেব ধমক দিয়া উঠিলেন, হয়েছে, থাম্। সবগুলো এবার জেলে যাবি তোরা, আমাকে শুদ্ধ ডোবাবি। যা, এখন খানা-পিনার ব্যবস্থা কর গে। আর ইয়াসিন কিংবা মোতালেব ফিরলেই আমাকে খবর দিবি।

ডি-সুজা হাসিতেছিল, কিন্তু বর্মীর মুখের দিকে চোখ পড়িতেই তাহার হাসি গেল বন্ধ হইয়া। শুধু বিবর্ণ নয়—অদ্ভুতভাবে রেখাংকিত আর অপরিচিত হইয়া উঠিয়াছে তাহার মুখশ্রী। একটা ভয়ের শিহরণ উঠিয়া আসিয়া তাহার পা হইতে শুরু করিয়া সমস্ত মাথা পর্যন্ত কাঁপাইয়া দিল। নৌকায় আসিতে কালো জল আর দিগন্তপ্লাবী অন্ধকারের মধ্যে যে অর্থহীন ভীতির শিহরণ তাহাকে আন্দোলিত করিয়াছিল—

সেই অনুভূতি আবার যেন ফিরিয়া আসিতেছে। ডি-সুজা অনুভব করিল তাহার বুকের লোমগুলি জামার তলায় ঘামে ভিজিয়া উঠিতেছে।

গল্প-গুজবের পর খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হইল। গাজী সাহেব আয়োজন মন্দ করেন নাই। বনিয়াদী বড়লোক, লোককে কী করিয়া খাওয়াইতে হয় সেটা জানেন। ভালো পোলাও, মাংস, আস্ত মুরগীর রোস্ট। পায়েসের বন্দোবস্তও আছে।

সব শেষে আসিল বোতল। গাজী সাহেব নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি, মদ স্পর্শ করেন না। বর্মীটা বেশি খাইল না, অতএব বোতলটা শেষ করার ভার ডি-সুজার উপরেই পড়িল।

বয়স হইয়াছে—মদ খাওয়াটা ছাড়িয়াই দিয়াছে প্রায়। ডি-সুজা সামান্য আপত্তি তুলিল। গাজী সাহেব অনুযোগ করিয়া কহিলেন, ডি-সুজার পূর্বপুরুষেরা পিপার পর পিপা মদ টানিয়া পাচার করিয়া দিত আর সামান্য একটা বোতলের জন্য ডি-সুজা ভয় পাইতেছে!

পূর্বপুরুষ! যাদুমন্ত্রের কাজ করিল কথাটা, চন্ করিয়া মাথায় রক্ত চড়িয়া গেল ডি-সুজার। দেখিতে দেখিতে নিঃশেষ হইয়া গেল বোতলটা, তারপর ডি-সুজা টলিয়া পড়িল মেজেতে—

নেশা ছুটিল পরের দিন—শেষ বেলায়।

আচ্ছন্ন চোখ দুটি কচলাইয়া লইয়া ভারী গলায় ডি-সুজা বর্মীর সন্ধান করিল।

গাজী সাহেব বলিলেন, চলে গেছে। ইয়াসিনের সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে যেতে সকালেই চলে গেল।

—চলে গেছে! আমাকে ফেলে! অকৃত্রিম বিস্ময়ে ডি-সুজা সোজা উঠিয়া বসিল।

—হাঁ, কী একটা জরুরি কাজ ছিল তার।

সন্দেহে ডি-সুজার মনটা মুহূর্তে ঘোলা হইয়া উঠিল। বর্মী চলিয়া গেল—তাহাকে একলা ফেলিয়াই!

লিসি বাড়িতেই আছে—আর—আর—

বিদ্যুৎ-চকিতের মতো ডি-সুজা কহিল, আমাকে এক্ষুণি যেতে হবে সাহেব। নৌকো আছে না?

—তা আছে। কিন্তু এখন তুমি কী করে যাবে? আকাশের অবস্থা দেখেছ?

আকাশের অবস্থা—হাঁ, সেটা দেখিবার মতোই বটে! শিকারী বাজের মতো আকাশের প্রান্তে প্রান্তে কালো মেঘ উড়িয়া আসিতেছে। ঋজু দীর্ঘ সুপারির বন প্রত্যাশায় নিস্তব্ধ। সামনে প্রকাণ্ড একটা নিম-গাছের মাথায় অসংখ্য বক আসিয়া বসিতেছে রাশি রাশি শাদা ফুলের মতো। চারিদিকে নিস্তব্ধ সমারোহ।

ঝড় আসিতেছে।

অতএব ঝড় না থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইল। বাতাস, বৃষ্টি। সমস্ত মনটায় তোলপাড় চলিতে লাগিল। এমন ঝড় এ বৎসর আর হয় নাই। ঘর বাড়ি কিছু পড়িয়া গেল কিনা কে জানে। তা ছাড়া লিসি একলা আছে বাড়িতে। জোহান—বর্মী—বিশ্বাস নাই কাহাকেও।

ঝড়ের পরে নৌকা লইয়া ডি-সুজা ফিরিল চর ইসমাইলে। রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে। চোখের সামনেই জ্বলিতেছে শুকতারা। বাড়ির সামনে দু-তিনটা সুপারি গাছ পড়িয়া—দরজাটা খোলা।

—লিসি!

কেহ সাড়া দিল না।

ডি-সুজা প্রায় আর্তনাদ করিয়া উঠিল, লিসি !

এবার সাড়া আসিল। তবে লিসির নয়। একটা পরিচিত তীব্র তীক্ষ্ণ চিৎকারে চারিদিক যেন চিরিয়া ফাড়িয়া খান্ খান্ হইয়া গেল। ডি-সুজা সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, বাড়ির প্রাচীরের উপর বীরের মতো গলা ফুলাইয়া তাহার সেই বড় মোরগটা তীব্র কণ্ঠে প্রভাতী ঘোষণা করিতেছে। গ্রামের কেহ তাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল—বোধহয় সুযোগ পাইয়া সে যথাস্থানে ফিরিয়া আসিয়াছে।

মোরগটা যথাস্থানেই ফিরিয়াছে, কিন্তু লিসি আর ফিরিল না। খবরটা সমস্ত চর ইসমাইলে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিল। জোহানকে খুন করিয়া বর্মীটা লিসিকে লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে। ডি-সিল্‌ভা তিন দিন যাবৎ শয্যাগত। ভয়ানক ভয় পাইয়াছে লোকটা, আছাড় খাইয়া নিজের পা-ও ভাঙিয়াছে।

৫

আর ওদিকে বলরাম ভিষক্‌রত্ন আবার সামাজিক হইয়া উঠিতেছেন।

কিছুদিন তিনি তো একেবারে অসূর্যম্পশ্য হইয়াছিলেন বলিলেই হয়। মুক্তো—মুক্তো—মুক্তো! তাহার শাড়ীর খস খস্ শব্দ শুনিবার জন্য তিনি উৎকর্ণ হইয়া থাকিতেন, তাহার চুড়ির শব্দ তাঁহার কানে জল-তরঙ্গ বাজাইত। মুক্তোর পায়ের শব্দ শুনিয়া তাঁহার হাতের তালু হইতে ক্রমগোলায়মান বটিকা টুপ করিয়া মাটিতে পড়িয়া যাইত এবং অসাবধানে ছাগলাদ্য ঘৃতের পাত্রটা উল্টাইয়া স্রোত বহাইয়া দিত। আর রাত্রি! সেগুলি যেন বাস্তব নয়—স্বপ্ন আর অনুভূতির ঘনত্ব।

কিন্তু আকস্মিক ভাবে বলরাম আবার আদি ও অকৃত্রিম হইয়া

উঠিলেন, বাহিরের জগৎটাকে আবার তিনি নিজের করিয়া লইলেন। নির্বিঘ্ন সুখ-শান্তি তিরোহিত হইয়া গেল রাধানাথের—দিনের মধ্যে তিরিশ বার করিয়া আবার তামাক যোগানো শুরু হইল। তাসের আসরে যথাযোগ্য উৎসাহ এবং উদ্দীপনা প্রকাশ পাইতে লাগিল বলরামের।

তাসখেলার সঙ্গীদের তিনি আবার জোটাইয়া লইয়াছেন। এবার আর হরিদাস সাহা নাই, তা তিনি নাই থাকিলেন। মাঝে মাঝে তাঁহার কথা মনে পড়িলেই শুধু বলরাম অস্বস্তি বোধ করেন। অলক্ষণে আর মুখফোঁড় হইলেও লোকটা তাঁহাকে ভালোবাসিত—হয় তো তিনিও তাহাকে সত্যই ভালোবাসিতেন। তা ছাড়া তাসের আসরে এমন জমাট গল্প বলিতে আর কেউ পারে না। কিন্তু কোথায় হরিদাস! ঝড়ের রাত্রে তেঁতুলিয়ার সেই তাণ্ডব—হরিদাসের এক মাল্লাই নৌকা কি সে ধাক্কা সামলাইতে পারিয়াছে!

তাসের আসরে বসিয়া বলরাম অন্যমনস্ক হইয়া যান, ভুল করিয়া বসেন। সঙ্গীর সক্ষোভ চিৎকারে চেতনা ফিরিয়া আসে।

—আহা-হা তুরুপ করলেন না কবিরাজমশাই! পিটটা শুধু শুধুই গেল!

নূতন পোস্টমাস্টারও বেশ মজলিস জমানো লোক। তা ছাড়া খাস-মহল অফিসের যোগেশবাবুও আসেন, মোটের উপর আড্ডাটা মন্দ জমে না।

তাস বাঁটিতে বাঁটিতে যোগেশবাবু বলেন, বুড়ো ডি-সুজা বোধ হয় পাগল হয়ে গেছে।

কবিরাজ বলেন, তাই নাকি!

—হুঁ। সারাদিন চুপ করে বসে থাকে। কারো সঙ্গে কথা কয় না। রাত্রে চিৎকার করে কাঁদে। বড্ড শোক পেয়েছে লোকটা।

কবিরাজ বলেন, বদলোকের অম্‌নিই হয়! মগ-টগগুলোর স্বভাবই ওই রকম।

যোগেশবাবু হাসেন, শয়তানের বন্ধুত্ব যে! তা ছাড়া বিশ্বাস করার নিয়মই এই। যে তোমাকে বেশি বিশ্বাস করবে, তাকেই তুমি বেশি করে ঠকাবে, তত বেশি করে সর্বনাশ করবে তার। এ নইলে আর কলিকাল বলে কেন!

খচ্‌ করিয়া কথাটা তীরের মতো আসিয়া বলরামের পাঁজরে বিঁধিয়া যায়। মুক্তোও তাহাকে বিশ্বাস করিত, খুব বেশি করিয়াই বিশ্বাস করিত। বলরাম তাঁহার যথাযোগ্য প্রতিদানই দিয়াছেন বটে। করবীর গোটা খাইয়া মুক্তো এখন তাহার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করিতে চায় বুঝি।

বলরাম জোর করিয়া হাসেন। মৃদু মৃদু হাসেন—তারপর হো হো করিয়া অট্টহাসি। যোগেশবাবু খানিকটা বিস্ময় বোধ করেন। তাঁহার কথার মধ্যে হাসাইবার এতটা উপাদান যে আছে সে কথা তিনি জানিতেন না। তাঁহার চোখের দিকে চোখ পড়িতেই আকস্মিকভাবে বলরাম থামিয়া যান—আরো বিস্ময়কর বলিয়া যোগেশবাবুর মনে হয় সেটাকে।

—কবিরাজমশাই এই সাত সকালেই কিছু মোদক খেয়েছেন বুঝি?

—মোদক! না তো—অকারণেই কবিরাজের চোখ মুখ রাঙা হইয়া উঠে।

তরপর সভা ভাঙিয়া যায়। সকলে বাহির হইয়া গেলে কবিরাজ একা বসিয়া থাকেন চুপ করিয়া। ফরশার আগুন আপনা হইতেই নিবিয়া আসে, হাওয়ায় হাওয়ায় ঘরময় ছাই উড়িয়া বেড়ায়। দেওয়ালে

কাচভাঙা ঘড়িটা কাঠঠোকরার মতো রুক্ষভাবে ঠক্ ঠক্ করে। বাজনাটায় কেমন করিয়া টান লাগিয়াছে—ন'টার সময় ঢং ঢং করিয়া বারোটা বাজিয়া যায়। কবিরাজের একবার মনে হয় উঠিয়া বাজনাটা ঠিক করিযা দিবেন কিন্তু দেহে মনে কোথাও কোন প্রেরণা আসিতে চায় না। চীনা ছবির অনাবৃতাঙ্গ মেয়েটির মোহিনী হাসির উপর মাকড়সারা নিঃশব্দে জাল বুনিয়া চলে।

ওদিকে অন্তঃপুরে খোলা জানালার সামনে মুক্তোও নীরবে বসিয়া থাকে। দূরে দেখা যায় নদী—একটা মরুভূমির মতো ধূ ধূ করে যেন। বাতাসে মুক্তোর রুক্ষ চুলগুলি মুখের উপর পড়িয়া কাঁপে। সমস্ত চেহারায় রুক্ষ পাণ্ডুরতা, কেবল চোখ দুটি কিসের স্পর্শে অত্যন্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। দেহের পরিবর্তন অতিশয় সুস্পষ্ট।

মুক্তো কী ভাবে কে জানে। বলরাম তাহার মনের কোনো সন্ধান পান না, তলও পান না আজকাল। মুক্তো যথাসাধ্য এড়াইয়া চলে তাঁহাকে। রাত্রে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দেয়। আশ্চর্য এই যে, চরম যাহা কিছু তাহা ঘটিবার পরেই সে বলরামকে ভয় করিতে শুরু করিয়াছে।

আগে দরজা বন্ধ করিত না। কিন্তু দু'দিন আগে একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেছে।

ঝড়ের পর হইতে বলরাম আলাদাই থাকেন। নিজের মধ্যে কেমন একটা অপরাধীর ভাব আসিয়াছে তাঁর, মুক্তোকে স্পর্শ করিতেই তিনি সংকোচ বোধ করেন। তা ছাড়া সে-ও যে তাঁহাকে এড়াইয়া চলিতে পারিলেই খুশি থাকিবে, ইহাও বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হয় নাই।

কিন্তু মধ্যরাত্রে ঘুম ভাঙিয়া বলরাম অত্যন্ত নিঃসঙ্গ বোধ করিলেন।

সেই নিঃসঙ্গতা—মুক্তো চরইস্‌মাইলে আসিবার পূর্বেকার সেই অনুভূতি। দেহ এবং মন একটা সুতীব্র বেদনায় আচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছে। বলরাম বিছানায় উঠিয়া বসিলেন। জানালার ওপারে চাঁদ উঠিয়াছে। বাতাসে চামেলির গন্ধ। নদীর হাওয়ায় শীত করিতেছে—অভ্যস্ত খানিকটা দেহের উত্তাপ পাইবার জন্য যেন লালায়িত হইয়া উঠিলেন বলরাম। স্বপ্নচারণার মতো নিঃশব্দে দরজা ঠেলিয়া তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। পাশের ঘয়ে মুক্তো অঘোরে ঘুমাইতেছে। দরজাটা ভেজানো, ধাক্কা দিতেই খুলিয়া গেল।

বিড়ালের মতো সতর্ক পা ফেলিয়া বলরাম আসিয়া দাঁড়াইলেন মুক্তোর পাশে। নিদ্রিত শান্ত মুখের উপর জ্যোৎস্নার পত্ররচনা। চোখের কোণে জল শুকাইয়া আছে—বাঁ গালের উপর উজ্জ্বল একটা সরল রেখা। নাকের সোনার ফুলটা করুণভাবে জ্বলিতেছে। পূর্ণায়মান দেহশ্রী অসম্বৃত বস্ত্রের অবকাশে উদ্‌ঘাটিত হইয়া আছে—যেন আত্মসমর্পণ করিতেছে নিজেকে। একটা অহেতুক করুণায় বলরামের মনটা ভরিয়া উঠিল।

ধীরে ধীরে নত হইয়া বলরাম মুক্তোকে স্পর্শ করিলেন।

ঘুমের মধ্যে ঠিক যেন সাপে কামড়াইয়াছে ঠিক এমনিভাবে চমকিয়া মুক্তো উঠিয়া বসিল। খোলা চুলগুলি তাহার ঘাড়ে বুকে ছড়াইয়া পড়িল, তাহার চোখের দৃষ্টি মনে হইল যেন পাগলের মতো। তারপর বলরাম কিছু ভাবিবার বা বলিবার আগেই মুক্তো তারস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিল, যাও তুমি, যাও!

বলরাম হতচকিত হইয়া পিছাইয়া আসিলেন। সবিস্ময়ে বলিলেন, মুক্তো!

মুক্তো কান্নায় প্রায় ভাঙিয়া পড়িল, না—না—যাও তুমি।

বলরামের স্বর করুণ হইয়া উঠিল, আহা-হা, কেন তুমি—

—তুমি যাও, নইলে আমি চেঁচিয়ে সব জাগিয়ে তুলব বলছি—উত্তেজনায় মুক্তো সোজা দাঁড়াইয়া উঠিল একেবারে। তাহার সর্বাঙ্গ তখন থর থর করিয়া কাঁপিতেছে।

বলরাম কয়েক মুহূর্ত নির্বোধের মতো দাঁড়াইয়া রহিলেন, তারপর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে অপরাধীর মতো বাহির হইয়া গেলেন। মুক্তো দিনের পর দিন যেমন দুর্বোধ্য, তেমনি দুরধিগম্য হইয়া উঠিতেছে। জ্বরাতিসারের লক্ষণগুলিও এমন জটিল নয় বোধ হয়। নিদানেরও অতীত।

বলরাম বাহির হইয়া গেলে মুক্তো সজোরে দরজায় খিল আঁটিয়া দিল। বলরাম সম্পর্কে সম্প্রতি কেন যে এই অহেতুক ভয় তাহার মনে জাগিয়াছে সে তাহা নিজেও বুঝিতে পারে না।

প্রথম মনে হইয়াছিল সে আত্মহত্যা করিবে। রাত্রির সেই কুৎসিত মোহগ্রস্ত আত্মসমর্পণগুলি মাঝে মাঝে তাহাকে পীড়া দিত বটে, কিন্তু মোটের উপর সেগুলিকে সে সহজ করিয়াই লইয়াছিল একরকম। তার-পর যখন সন্তান আসিয়া সাড়া দিল, তখন ঘৃণা এবং লজ্জায় মুক্তো আত্ম বিস্মৃত হইয়া গেল একেবারে। হইলই বা পাণ্ডব-বর্জিত দেশ, লোক-লজ্জা না হয় না থাকিল, কিন্তু মনকে সে বুঝাইবে কী বলিয়া এবং কী করিয়া?

অতএব সে আত্মহত্যার সংকল্প করিল। কিন্তু ভয় করে আত্মহত্যা করিতে। মনে পড়িয়া যায় গ্রামের বলাই পালকে, গলার নলীতে একটা ভোঁতা ক্ষুর বসাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছিল। তবুও একবার সে শাড়ীটাকে বেশ করিয়া দড়ির মতো পাকাইয়া চালের পাটাতনের

উচ্চতাও হিসাব করিয়াছিল পর্যন্ত। কিন্তু ধীরে ধীরে একটা অদ্ভুত কৌতূহল তাহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া দিল।

সন্তান আসিতেছে। তাহার দেহের অভ্যন্তরে ছোট একটি মাংসপিণ্ডের আকারে একটা নূতন বিস্ময় রূপ পাইতেছে। নিজের রক্ত দিয়া, আয়ু দিয়া মুক্তো পালন করিতেছে তাহাকে—গড়িয়া তুলিতেছে প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে তাহাকে পূর্ণ করিয়া। নিজের মধ্যে এই বিরাট শক্তি—এই বিশাল সৃষ্টি-ক্ষমতার কথা ভাবিয়া আজ আর মুক্তোর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। স্বামী-পরিত্যক্ত বিড়ম্বিত তাহার জীবন—গ্রামের মেয়ের পরম কাম্য এবং একান্ত লোভের বস্তু সন্তানকে পাইবার দুরাকাঙ্ক্ষা সে ভুলেও করিতে পারে নাই। অন্যের শিশুকে লোভীর মতো বুকে টানিয়া লইয়াছে, কিন্তু তাহাতে ব্যথাই বাড়িয়াছে শুধু, কিছুমাত্র কমে নাই। সেই সন্তান! সেই সন্তানের জননী হইতে চলিয়াছে সে! অকস্মাৎ নিজের জীবনের প্রতি মুক্তোর অত্যন্ত মমতা হইল। সে বাঁচিতে চায়, নিজের সৃষ্টিকে সে স্থায়ী করিয়া যাইতে চায় এই পৃথিবীর বুকে। কিন্তু পিতৃ-পরিচয়? না—অত কথা অত ভবিষ্যতের ভাবনা সে ভাবিতে চায় না। এক মাত্র মাতৃত্বেই তাহার লোভ—দুর্বার এবং প্রচণ্ড।

বলরামকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিয়া মুক্তো যখন জানালার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহার ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছে, হৃৎপিণ্ড দুইটায় আন্দোলন চলিতেছে প্রমত্তভাবে। এতক্ষণে—এতক্ষণে সে বুঝিয়াছে বলরামকে কেন সে এত ভয় করিতেছে। এই পিতৃত্ব বলরাম চায় না—এই পিতৃত্ব তাহার পক্ষে অভিশাপ। তাই বলরামের ভীরু দৃষ্টির মধ্যে মুক্তো দেখিয়াছে হত্যাকারীর চোখ—তাহার সন্তানকে

হত্যা করিয়া কাপুরুষ দায়মুক্ত হইতে চায়। নির্বোধ সারল্যের নেপথ্যে ঝক্ ঝক্ করিতেছে তীক্ষ্ণাগ্র ছুরি ফলক।

তড়িৎগতিতে একটা তীব্র বেদনা পেটের মধ্য হইতে ঠেলিয়া উঠিয়া ব্যথায় যেন সর্বাঙ্গ অবশ করিয়া দিল মুক্তোর। দেহের নিভৃত রহস্যলোক হইতে একটা জীবন সত্তা কিসের যেন ক্ষুব্ধ আকাশে থাকিয়া থাকিয়া তাহার পাঁজরে ক্রমাগত আঘাত করিতেছে। ব্যথায় মুক্তোর সমস্ত শরীর আচ্ছন্ন হইয়া আসিল, চোখ দুটি বুজিয়া আসিল। জানালার শিক ধরিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল সে।

মণিমোহনের দিনগুলি কাটিতে লাগিল পুরাতনের পুনরাবৃত্তি করিয়া। প্রজাদের ডাকাইয়া আনা, টাকার জন্য তাগিদ দেওয়া। অপরিচ্ছন্ন অমার্জিত নানাস্তরের লোকের ভিড়। অশ্রান্ত বকুনি শোনা এবং অবিশ্রামভাবে বকিয়া যাওয়া।

দেখা গেল—দেনাটা মজাঃফর মিঞারই সব চাইতে বেশি এবং সেই জন্য তোষামোদটাও তাহার দৈনন্দিন হইয়া দাঁড়াইল। ব্যাপারটা গোপীনাথই অনুধাবন করিল সব চাইতে আগে এবং আর যাই হোক, মণিমোহনের নৌকায় মুরগীর অভাব রহিল না।

মজাঃফর মিঞা অনুতপ্ত বোধ করিতে লাগিল। শৃগালকে ভাঙা বেড়া দেখানোর সম্পর্কে প্রচলিত প্রবচনটি মনে পড়িল তাহার। এইভাবে প্রতিদিন মন যোগাইবার চেষ্টা না করিয়া কয়েকটা টাকা ফেলিয়া দিলেই ত চুকিয়া যাইত। কিন্তু যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে—এখন প্রায়শ্চিত্ত চলিবে।

গোপীনাথের তাহাতে তৃপ্তি নাই—তাহার উদরে ভূমা আসিয়া বাসা বাঁধিয়াছে। বলে, রোজ রোজ আর মুরগী খেতে ভালো লাগে না মিঞা, খাসী টাসী খাওয়াও একটা।

—খাসী! জাফরাণ রাঙানো দাড়ির মধ্যে মজাঃফর মিঞার বিপন্ন আঙুলগুলি শক্ত হইয়া আসে: তাই তো, খাসী!

গোপীনাথ অধৈর্য হইয়া উঠে, হাঁ-হাঁ, খাসী। বেশ তেল চুক্‌চুকে। আমরা হিঁদুর ছেলে, আমাদের ওই কুঁকৃড়ো মুকড়ো আর কতদিন সহ্য হয়! জুৎসই একটা খাসী পেলে বেশ প্রেমসে—গোপীনাথ জিভ দিয়া একটা অর্থপূর্ণ সলোভ শব্দ করে।

—তাই তো বাবু, খাসী কোথায় পাওয়া যাবে?

কোথা হইতে কাসেম খাঁর ব্যাটা আসিয়া ছোঁ মারিয়া কাড়িয়া নেয় কথাটা। মজাঃফর মিঞাকে বিপন্ন করিবার জন্যই যেন সে সব সময়ে খাপ পাতিয়া আছে।

বলে, কেন চাচা, অমন ইয়া ইয়া তোমার খাসী, দশ-পনেরো সের গোস্ত হবে এক একটায়। তারই একটা দিয়ে দাও না বাবুদের।

গোপীনাথ সোৎসাহে বলে, বটে, বটে!

দুই চোখে আগুন জ্বলিয়া ওঠে মজাঃফর মিঞার। এই হতভাগা ছোকরাটাই তাহাকে ডুবাইবে। কবে সে তাহার ক্ষেতে মহিষ নামাইয়া জোর করিয়া ধান খাওয়াইয়াছে, তাহার শোক আজও ভুলিতে পারিল না। কোথায় থাকে কে জানে—ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারিয়া দেয় নির্ঘাৎ।

মজাঃফর করুণ কণ্ঠে বলে, বিশ্বাস করবেন না হুজুর, বিশ্বাস করবেন না। ও চ্যাংড়া ভয়ানক মিথ্যেবাদী। দিনকে রাত করতে পারে ও।

ছোকরাও ছাড়িবার পাত্র নয়। সে সভাস্থ সকলকে তৎক্ষণাৎ

সাক্ষী মানিয়া বসে। বলে, আমি মিথ্যে বলছি ? তা হলে হুজুর নিজেই যাচাই করে নিন। এই ইয়াকুব রয়েছে, এই আনিসুদ্দীন আছে, ওই জাফর—সবাইকে জিজ্ঞেস করুন মজাঃফর চাচার তিনটে বড় বড় খাসী আছে কিনা।

এসব কথা আর আলোচনা করিয়া খুব বেশি করিয়া সাড়া তোলে না মণিমোহনের মনে। তাহার সমস্ত চেতনায় কেমন একটা আলোড়ন শুরু হইয়াছে। এই জল, এই আকাশ বাতাস—উপনিবেশের এই সব বিচিত্র মানুষের দল। ইহারা ক্রমেই মণিমোহনের ভাবনায় প্রেতচ্ছায়া ফেলিতেছে, যেন কী একটা অদ্ভুত জিনিস সঞ্চার করিতেছে তাহার রক্তে! বিদ্রোহী প্রমিথিয়ুস্ যেদিন আগুন আনিয়াছিল, সেদিন সে আগুনের ব্যবহার কাহারো জানা ছিল না—সে আগুন নিজেদের ঘরে লাগাইয়া দিয়া অন্ধ-উল্লাসে তাহারা উৎসব করিয়াছিল হয় তো। সেই মূঢ় আনন্দ আসিয়া যেন তাহাকে আচ্ছন্ন করিতে চায়, নিজের শিক্ষা-দীক্ষা সব কিছুকে বিদ্রোহের আগুনে দগ্ধ করিয়া—

বোটে বসিয়া মণিমোহন দেখে জল বহিয়া চলিয়াছে। অবিশ্রান্ত—অতলস্পর্শ। পাল তুলিয়া মাঝে মাঝে নৌকা যায়। মহাজনী নৌকার দীর্ঘ মাস্তুলের আগায় কাক বসিয়া থাকে ধ্বজার মতো।

মণিমোহনের মাঝিরা আলাপ করিতে চায়। ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে, নৌকা কোথা থেকে আসছে ভাই ?

হয় তো জবাব আসে, লালমোহন।

—কোথায় যাবে ?

—ওপারে আমতলী হয়ে বগার বন্দরে।

বগা। নামটা অপরিচিত নয় একেবারেই। পটুয়াখালি মহকুমার

স্বনামধন্য বন্দর আর গঞ্জ। এত বড় প্রকাণ্ড ধান আর চাউলের আড়ত বাংলা দেশের শস্যভাণ্ডার। এই জেলাতেও খুব বেশি নাই। লক্ষপতি মহাজনেরা ওখানে ধান চাউলের পাহাড়ের উপর বসিয়া দেশের ক্ষুধার্ত অঞ্জলিতে মুষ্টিভিক্ষা বর্ষণ করিতেছে—অবশ্য মূল্য বিনিময়ে। আর—সেই সঙ্গে ভাবিয়া বিস্ময় লাগে যে বরিশাল জেলায় দুর্ভিক্ষ চলিতেছে। সরকার হইতে বীজধান কিনিবার ও আবাদ করিবার জন্য চাষীদের যে টাকা ধার দেওয়া হইয়াছিল, সে টাকা আদায় করিবার জন্যই তাহার এই অভিযান।

গোপীনাথ আসিয়া বলে, এবার তো খুব ভালো ধান হয়েছিল বাবু। তবু দেশের অবস্থা যে কে সেই।

ভালো ধান হইয়াছিল সত্য। মণিমোহন নিজের চোখেই তো দেখিয়াছে। এই কালুপাড়া—শুধু কালুপাড়া কেন—আশে পাশের যে কোনো চরের দিকে তাকাইলেই লক্ষ্মীশ্রীতে চোখ ভরিয়া তুলিত একেবারে। বৃষ্টি হইয়াছে, নিয়মিত বর্ষার বানে নতুন পলি পড়িয়া ধানের ক্ষেত উর্বর হইয়াছে। আর ধানের শীষগুলি শাঁসে সমৃদ্ধ হইয়া বাতাসে দোল খাইতেছে। ধীরে ধীরে মেঘ-বরণ সেই ধানে সোনার আভা লাগিল। দুদিন পরেই কাস্তে পড়িবে—দেশ ও জাতির সমস্ত স্বপ্ন আর আশা উদগ্রীব চোখ মেলিয়া তাকাইয়া আছে এই ধানের দিকেই।

কিন্তু স্বপ্ন আর আশা। কতটুকু তাহার ফলিল, সার্থকতা লাভ করিল কী পরিমাণে। পৃথিবীর খনি হইতে যাহারা জীবনমূল্যে এই সোনা আহরণ করিল, তাহাদের বুভুক্ষু চোখের সাম্‌নে দিয়া তাহা চলিয়া গেল বগায়, সাহেবগঞ্জে, টর্কীতে আর ঝালকাঠির বন্দরে। মহাজনের গোলায় বস্তা ভরিয়া সেই ধান আশ্রয় পাইল। তারপর—তারপর?

তারপর যাহা চিরকাল ঘটিয়া আসিতেছে। দুর্ভিক্ষ—ওটা তো লাগিয়াই আছে—গাছে পাতা এবং মাঠে ঘাস থাকিতে কোনো দুশ্চিন্তা নাই সেজন্য। সরকার? সরকারের দোহাই দিলে শিয়াল কুকুরেও হাসিয়া উঠিবে।

কিন্তু এ সব ভাবিয়া মণিমোহনের বিশ্রী লাগে। কেন সে ভাবিতে চায় এত কথা? চাকরী করিতে আসিয়াছে, চাকরীই করিয়া যাইবে।

গোপীনাথ আসিয়া মাঝে মাঝে গল্প করিতে চায়। দেশের কথা, বৌয়ের কথা। মণিমোহনকে সে সমব্যথী বলিয়াই জানে।

বলে, এবার বিশে ফাল্গুন দোলযাত্রা।

মণিমোহন হাসিয়া বলে, তাই নাকি? কী করে জানলে?

—বাঃ জানব না? গোপীনাথ চোখ বড় বড় করিয়া বলে, হিন্দুর ছেলে।

—কিন্তু জেনে কী লাভ?

— লাভ? তাই বটে। সব সময়ে সে কথা মনে থাকে না। গোপীনাথ বিষণ্ণ আর গম্ভীর হইয়া যায়। যা দেশ! দোল-দুর্গোৎসব যাহা কিছু, কাহারো কোনো মূল্য নাই! চাকুরীর দুর্ভাগা জীবন। খাতা খুলিয়া হিসাব লেখা, প্রজাদের সঙ্গে বকাবকি করা, টাকা পয়সা গুণিয়া লওয়া আর মাঝে মাঝে এক আধটা মুরগীর ঠ্যাং চর্বণ। ইহাই আদি এবং ইহাই অন্ত।

—গত বছর দোলের সময়—বলিয়াই থামিয়া যায় গোপীনাথ। মনটা ব্যাকুল হইয়া ওঠে তাহার। এ-ও তো বাংলা দেশ—বাংলা দেশ? এ যেন আর এক পৃথিবী। এখানকার মানুষগুলি প্রক্ষিপ্ত। দোল ইহাদেরও আছে, কিন্তু মানুষের রক্তে। জমি লইয়া, ধান কাটা লইয়া।

গোপীনাথ বসিয়া বসিয়া খানিকক্ষণ দেশের গল্প করে, বৌয়ের কথা বলে, নিজের পাঁচ বছরের ছেলেটার কথা ভাবিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তারপর উঠিয়া যায় রান্না চাপাইতে। বজরার বাহিরে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসে, ডায়েরীর লেখাগুলো ক্রমশ অস্পষ্ট হইয়া মিলাইয়া যায়, মণিমোহন আসিয়া দাঁড়ায় বজরার ছাদের উপর ; নদী অসম্ভব শান্ত। যেন ঘুম-পাড়ানি গান গাহিয়া চলিয়াছে।

বর্মী মেয়েকে কদিন ধরিয়া আর দেখা যায় নাই। তার জন্য দোষ অবশ্য বর্মী মেয়ের নয়। সেদিনকার সেই ব্যাপারের পর মণিমোহন আর গ্রামের দিকে পা বাড়ায় নাই।

সমস্ত মনটা তাহার দিন কয়েক কেমন আচ্ছন্ন হইয়া ছিল, অত্যন্ত অশুচি বোধ হইয়াছিল নিজেকে। কিন্তু ধীরে ধীরে আত্মস্থ হইয়া উঠিতেছে মণিমোহন। গভীর রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে বজরার জানালা দিয়া যখন হলদে চাঁদের আলো আসিয়া মুখে পড়ে, আর নদীর উপর দিয়া গাঙ-শালিকের চিৎকার তীক্ষ্ণ আর করুণ হইয়া ভাসিয়া যায়, তখন মণিমোহনের যাহাকে মনে পড়ে, আশ্চর্য এই যে রাণী সে নয়। অর্ধতন্দ্রার মধ্যে মণিমোহন যেন দেখিতে পায় কাহার দুটি নীল গভীর চোখ আবেশে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে, সাপের মতো বেণী-করা কাহার চুল তাহার চোখে মুখে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। একটা স্বেদাক্ত দেহের দৃঢ় কোমল বন্ধন তাহার সর্বাঙ্গ নিবিড় করিয়া ঘিরিয়া আছে যেন—তাহার চুলের গন্ধ, তাহার মুখের মিষ্টি গন্ধ, তাহার ঘামের গন্ধ তাহাকে ক্লোরোফর্মের মতো অচেতন করিয়া ফেলিতেছে।

তন্দ্রা টুটিয়া যায়। বজরার মধ্যে লঘু অন্ধকার। গোপীনাথের নাক ডাকিতেছে। চুলের গন্ধ নয়—জল ও ভিজা মাটির সোঁদা গন্ধ

ছড়াইয়া যাইতেছে বাতাসে। দূরে তেঁতুলিয়ার বুকে পাড়ি ধরিয়া কোনো মাঝি ভাটিয়ালির সুর তুলিয়াছে :

"রজনী আন্ধার ঘোর মেঘ আসে ধাইয়া,
পার কর নাইয়া—"

৬

গঞ্জালেস্ চাটগাঁয়ে ফিরিল বটে, কিন্তু কবির ভাষায়, গোটা মনটা লইয়া সে ফিরিতে পারিল না। আধখানা তাহাকে রাখিয়া আসিতে হইল চর ইস্মাইলে। গঞ্জালেস্কে শনিতে পাইল বলিলেই কথাটা ঠিক করিয়া বলা হয়।

এতদিন তো কাটিতেছিল বেশ। আর যাই হোক নারী-সম্পর্কিত অভাব বোধটা গঞ্জালেসের ছিল না। অর্থশুল্কেই দৈহিক দাবীটা মিটিতেছিল, দেহের নিতান্ত স্থূল দিক ছাড়া মেয়েদের আর কোনো প্রয়োজন আছে এ কথা গঞ্জালেসের কখনো মনে হয় নাই। অন্তত উত্তরাধিকার-সূত্রে আর কিছু না পাইলেও পৈতৃক এই মনোভাবটা সে আয়ত্ত করিয়াছিল। বিবাহ করিয়া তাহার দায় টানিয়া চলা—এটাকে নির্বোধের বিড়ম্বনা বলিয়াই তামার মনে হইয়াছিল এতকাল, কিন্তু অকস্মাৎ যেন গঞ্জালেসের ভ্রম ভাঙিল।

আর সেটাকে প্রথম আবিষ্কার করিল তাহার বন্ধু পেরিরা।

সহরের বাহিরে ছোট একটা বাড়ি করিয়া লইয়াছিল গঞ্জালেস্। নারিকেলের কুঞ্জে ঘেরা—নিরালা এবং নিভৃত। একটু দূরেই কর্ণফুলী। জাহাজ-ঘাটের কালো কালো ধোঁয়াগুলি এখান হইতে দেখা গেলেও মোটের উপর জায়গাটি নিরিবিলি এবং শান্তিপূর্ণ।

দুপুর-বেলায় পেরিরা আসিয়া দেখিল, বাহিরের ঘর খোলা, কিন্তু গঞ্জালেস্ নাই। পেরিরা ভিতরে ঢুকিল, কিন্তু গঞ্জালেস্ সেখানেও নাই। এই দুপুর-বেলায় ঘর-দুয়ার সব খোলা রাখিয়া লোকটা গেল কোথায় ?

এমনি সময় মুসলমান বাবুর্চিটির সঙ্গে দেখা হইল। পেরিরা তাহাকে প্রশ্ন করিল, সাহেব কোথায় ?

বাবুর্চি মৃদু হাসিয়া জবাব দিল, বাগানে।

—বাগানে ? বাগানে কী করছে ?

বাবুর্চির মৃদু হাসিটা আর একটু স্পষ্ট হইয়া উঠিল। দাড়ির ফাঁকে শাদা দাঁতগুলি ঝক্ ঝক্ করিয়া উঠিল তাহার। বলিল, গাছে চড়ছে।

—গাছে চড়ছে ! সে কী !

—যান্—দেখুন না। বাবুর্চি প্রস্থান করিল।

গাছে চড়িতেছে এই ভর দুপুর-বেলায়। লোকটার কি মাথা খারাপ হইয়াছে নাকি। না অতিরিক্ত খানিকটা ব্র্যাণ্ডি গিলিয়া যা খুশি তাই করিতে শুরু করিয়াছে ! পেরিরা ছুটিয়াই বাগানে গেল।

কোথাও কেহ নাই। পেরিরা চীৎকার করিয়া ডাকিল, স্যামুয়েল !

অন্তরীক্ষ হইতে সাড়া আসিল, এই যে !

—অ্যাঁ, তাই তো ! পেরিরা নিজের চোখ দুইটাকে বিশ্বাস করিতে পারিল না—বাবুর্চি তাহা হইলে বানাইয়া বলে নাই এক বিন্দুও ! নারিকেল গাছের মাথায় বসিয়া আছে গঞ্জালেস্। মুখের ভাব অত্যন্ত গর্বিত এবং প্রসন্ন—যেন কেহ তাহাকে দিল্লীর তখ্‌ত-তাউসে বসাইয়া

দিয়াছে। কিন্তু ব্যাপার দেখিয়া পেরিরার শূলে চড়ানোর মতই বোধ হইল।

—আরে পাগল নাকি! এই দুপুরবেলা নারকেল গাছে? নামো, নামো।

স্যামুয়েল সামান্য অপ্রতিভ বোধ করিল। বহু কষ্টে টানা-হেঁচড়া করিয়া মাটিতে পদার্পণ করিল সে। অনভ্যাসের ফলে শার্টটা ছিঁড়িয়া গিয়াছে অনেকখানি। ছাল ছড়িয়া তিন-চার জায়গা হইতে রক্ত পড়িতেছে। কিন্তু সেদিকে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই, মুখে পরিতৃপ্ত প্রসন্নতার হাসিটি আঠার মতো লাগিয়া আছে।

পেরিরা হাঁ করিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার পর খানিকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিল, ব্যাপার কী তোমার? হঠাৎ এই ভাবে গাছে চড়তে শুরু করেছ, গাঁজা খাচ্ছ নাকি আজকাল?

—না, গাঁজা খাচ্ছি না। স্যামুয়েলের কণ্ঠস্বর অপ্রসন্ন শুনাইল, অভ্যাস করছি।

—অভ্যাস করছ! এত অভ্যাস থাকতে গাছে চড়া?

—ওসব তুমি বুঝবে না—পেরিরার কাঁধে একটা থাবড়া দিয়া গঞ্জালেস্ তাহাকে বাড়ির মধ্যে লইয়া আসিল: কী বলে, একটু ব্যায়াম করে নিলাম আর কি। গাছে চড়া স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব ভালো জিনিস।

—কিন্তু এই দুপুরবেলা?

—এসো এসো, চা খাওয়া যাক এক পেয়ালা।

নারিকেল গাছে ওঠা লইয়াই ব্যাপারটা আরম্ভ হইল, কিন্তু শেষ হইল না। দিনের পর দিন গঞ্জালেসের পরিবর্তন শুরু হইল। বাহির

আর নয়—এবার ঘর। লিসির তামাটে আরাকানী মুখখানা যখন তখন আসিয়া স্বপ্ন-সঞ্চার করিয়া যায়। কাজকর্মে আলস্য আসিয়াছে। জাহাজের খোল বোঝাই করিয়া শুট্‌কি মাছ তুলিয়া দিতে গিয়া গঞ্জালেস্ লিসির কথা ভাবিতে শুরু করে, বস্তা গণিতে ভুল হইয়া যায়। পেরিরা আসিয়া সন্ধ্যার আড্ডায় যাওয়ার জন্য টানাটানি করে কিন্তু তাহাকে নড়াইতে পারে না।

বলে, কী ব্যাপার ? যাবে না ?

গঞ্জালেস্ সংক্ষেপে বলে, উঁহু !

—কেন ? রাতারাতি সুবুদ্ধি চাড়া দিল নাকি ? সেণ্ট জন হওয়ার মতলবে আছ ? জেরুজালেম রওনা হচ্ছ নাকি ?

পরিহাসে বর্মচর্ম ভেদ হয় না। ততোধিক সংক্ষেপে গঞ্জালেস্ জবাব দেয়—হুঁ।

পেরিরা নিরাশ হইয়া যায়। কী যেন হইয়াছে লোকটার। আধি-ব্যাধি কিছু নয় তো ? কিন্তু ভাব দেখিয়া তা তো মনে হয় না। খাওয়ার সময় বরং ডবল পরিমাণে গিলিতে শুরু করিয়াছে আজকাল। তবে কি মাথা খারাপ হইয়া গেল ? ভাবিয়া অত্যন্ত মনঃকষ্ট বোধ করে পেরিরা।

নাঃ, আর দেরী করা ঠিক নয়। গঞ্জালেস্ অধীর হইয়া উঠিল। যেমন করিয়া হোক লিসিকে আনিতেই হইবে। কাজকর্ম সব গোল্লায় যাইতেছে—লোকজন যাহারা কাজ করে তাহারা চুরি-চামারি করিতেছে আপ্রাণ। সর্বোপরি তাহাকে পাগল ভাবিয়া পেরিরা যে সব কাণ্ড করিতে শুরু করিয়াছে, তাহাতে গঞ্জালেসের মাথায় খুন চাপিয়া যায় একরকম।

কথা নাই বার্তা নেই, পেরিরা আসিয়া গঞ্জালেসকে টানিয়া বাহির করিল। বলিল, আজ রবিবার, চলো গীর্জায় যাই।

—গীর্জা? এবার হাঁ করিবার পালা গঞ্জালেসের। পেরিরা গীর্জায় যাইতে চায়—ইহাও এ জন্মে তাহাকে দেখিতে হইল! গঞ্জালেস্ বলিল, গীর্জায়!

—হাঁ, হাঁ, গীর্জায়। চল না।

খানিকটা বিস্ময় এবং কিছুটা কৌতুক বোধ করিয়া গঞ্জালেস্ গীর্জায় আসিল। প্রার্থনা ইত্যাদির ব্যাপার শেষ হইলে ফাদার আসিয়া গঞ্জালেস্ ও পেরিরাকে পাশের একটা ছোট ঘরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন।

গঞ্জালেসের সবই কেমন রহস্যময় বোধ হইতেছিল। রহস্যটা আরো বেশি প্রগাঢ় হইয়া আসিল তখনই—যখন পাদ্রী সাহেব খানিকক্ষণ তাহার মুখের দিকে কট্‌মট্ করিয়া তাকাইয়া রহিলেন। তারপর বিড় বিড়্ করিয়া কী খানিকটা প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, শয়তান, বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও। মুক্তি দাও এর আত্মাকে।

গঞ্জালেস বোবার মতো চাহিয়াই রহিল। পাদ্রী সাহেব আবার কহিলেন, শয়তান, পৃথিবীতে অনেক পাপীর আত্মা আছে, যাদের তুমি ইচ্ছে করলেই নরকে টেনে নিয়ে যেতে পারো। কিন্তু এর পবিত্র আত্মা ভগবানের দাসত্বে নিয়োজিত, একে তুমি হরণ করতে পারো না।

মুহূর্তে গঞ্জালেসের অধিগম্য হইল ব্যাপারটা। পেরিরার দিকে তাকাইল, দেখিল সে মিটি মিটি হাসিতেছে। গঞ্জালেসের মেজাজ সঙ্গে সঙ্গে বেঠিক হইয়া গেল। তাহাকে বেকুব বানাইয়া তাহার খরচায় খানিকটা হাসিয়া লইবার চেষ্টা। অশ্রাব্য ভাষায় সে পাদ্রী সাহেব এবং

পেরিরাকে একটা গালি বর্ষণ করিয়া বেগে বাহির হইয়া গেল। পাদ্রী সাহেব চোখ দুটি বিস্ফারিত করিয়া সখেদে কহিলেন, হায়, শয়তান এর আত্মাকে একেবারে খেয়ে ফেলেছে।

শয়তান আত্মাকে খাক্ বা না খাক্, গঞ্জালেস বাহির হইয়া আসিয়া আর বিলম্ব করিল না। নৌকা সাজাইয়া লইয়া সে চর ইস্‌মাইলের পথে পাড়ি জমাইল। এবারে লিসিকে লইয়া তবেই সে ফিরিবে।

সন্দীপ হইয়া আসিলে অনেকটা ঘুরিতে হয়, কাজেই সোজাসুজি পাড়ি ধরিল সে। হাতিয়ার মোহনায় নদী আর সমুদ্রে যেখানে একাকার হইয়া গিয়াছে—সেখান দিয়া নীল জলের উপর নৌকা চালাইয়া সে আসিল সাহাবাজপুরের নদীতে। এম্‌নি সময় ঝড় উঠিল রুদ্র-মূর্তি লইয়া। ভোলার দ্বীপের এক প্রান্তে আশ্রয় লইয়া গঞ্জালেসের নৌকা সে ঝড় হইতে আত্মরক্ষা করিল—তারপর ভোলার কূলে কূলে নৌকা বাহিয়া তেঁতুলিয়া পার হইয়া সে চর ইস্‌মাইলে আসিয়া দেখা দিল।

সকালের আলোয় স্নান করিতেছে চর ইস্‌মাইল। কোথাও এতটুকু কোনো পরিবর্তন নাই। চৈত্রের স্পর্শে জলের নীল রঙ একটু একটু শাদা হইয়া উঠিতেছে, উপরের কোনো কোনো নদীতে ঢল্ নামিতেছে বোধ হয়। পর্তুগীজদের ভাঙা-গীর্জার ওখানে ঝির্ ঝির্ করিয়া তেমনই মাটি ভাঙিতেছে।

নৌকা হইতে নামিয়া কয়েক পা হাঁটিতেই ডি-সিল্‌ভার সঙ্গে দেখা হইল তাহার।

ডি-সিল্‌ভা খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আসিতেছিল। এক হাতে লাঠি। এক পায়ে বেশ করিয়া ন্যাকড়া জড়ানো। সুডোল ভুঁড়িটা কয়দিনের মধ্যেই কেমন চুপসাইয়া ছোট হইয়া গেছে।

গঞ্জালেস্‌কে দেখিয়া ডি-সিলভা থামিল। তাহার চোখে মুখে এক ধরনের আত্ম-প্রসাদ প্রকাশ পাইল। সে নিজে বুড়ো এবং ভুঁড়ো—এই কার্তিকটিকে জামাই করিবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেছিল ডি-সুজা। সকলের আশায় ছাই দিয়া লিসিকে কে লইয়া গেছে।

বলিল, আরে, এই যে স্যামুয়েল সাহেব। কী মনে করে?

—বেড়াতে এলাম।

—বেড়াতে? বেশ, বেশ। কিন্তু একটা ভারী দুঃসংবাদ আছে যে।

—দুঃসংবাদ? গঞ্জালেস্‌ থমকিয়া থামিয়া দাঁড়াইল, কিসের দুঃসাবাদ?

—আর বলো কেন। লিসিকে বর্মীবা চুরি করে নিয়ে গেছে। আর তার শোকে বুড়ো ডি-সুজা পাগল। দিন রাত কাঁদছে আর—

বলিয়াই আড় চোখে চাহিয়া দেখিল, গঞ্জালেসের উপর আশাতীত ফল হইয়াছে। তাহার সমস্ত মুখ মুহূর্তে শাদা হইয়া গিয়াছে—পা দুইটা কাঁপিতেছে থর থর করিয়া, চোখের দৃষ্টি শূন্য আর অর্থহীন।

অত্যন্ত ভালো মানুষের মতো খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে ডি-সিলভা চলিয়া গেল।

ডি-সুজা সংক্রান্ত খবরটা যথা সময়ে আসিয়া পৌঁছিল নুরুল গাজীর কানে।

ব্যাপারটা শুনিয়া গাজী সাহেব বিস্মিত হইলেন না। লিসিকে দেখিয়া তাঁহারই এক সময়ে কিছু চিত্ত-চাঞ্চল্য জাগিয়াছিল, কাজেই অন্যে যে তাহার উপর ছোঁ মারিয়াছে এটা এমন কিছু অসম্ভব বা

অপ্রত্যাশিত ব্যাপার নয়! কিন্তু এই উপলক্ষে তাঁহাদের ব্যবসায়-গত ব্যাপারটা ফাঁস না হইয়া যায় সেটা ভালো করিয়া দেখিবার জন্য তিনি চর ইস্‌মাইলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ডি-সুজা চুপ করিয়া রোয়াকে বসিয়াছিল। এই কয়দিনেই অদ্ভুত পরিবর্তন হইয়াছে তাহার চেহারায়। পাড়ার কে একটি মেয়ে আসিয়া তাহাকে খাওয়াইয়া দিয়া যায়, কিন্তু ওই পর্যন্তই। সমস্ত দিন সে নীরবে বাড়ির রোয়াকে বসিয়া থাকে, কাহারো সঙ্গে কথা বলে না। তারপর রাত্রি যখন আসে—রাত্রি আসে নয়—রাত্রি যখন গভীর হয়, সে অদ্ভুত অমানুষিক স্বরে চিৎকার করিয়া কাঁদে। সে কান্না শুনিলে সারা গা ছম্ ছম্ করিয়া ওঠে।

গাজী সাহেব ডাকিলেন, বুড়া সাহেব!

এই নামেই ডি-সুজা পরিচিত। কিন্তু বুড়া সাহেব জবাব দিল না।

গাজী সাহেব আবার কহিলেন, বুড়া সাহেব!

ডি-সুজা কটমট করিয়া তাঁহার দিকে তাকাইল। তাহার চোখ দেখিয়া গাজী সাহেব শিহরিয়া পিছাইয়া আসিলেন। শরীরের সমস্ত রক্ত যেন চোখে আসিয়া জমা হইয়াছে তাহার। খুন করিবার আগে মানুষের চোখ এম্‌নি হইয়া ওঠে বোধ হয়।

—বিস্‌মিল্লা!

স্বগতোক্তি করিয়া গাজী সাহেব বাহির হইয়া আসিলেন। ডি-সুজার সম্পর্কে আর কোনো ভরসাই নাই। একেবারে গোল্লায় গিয়াছে—উন্মাদ পাগল।

রাস্তায় নামিয়া গাজী সাহেবের মনে হইল, একবার কবিরাজের সঙ্গে দেখা করিয়া গেলে নেহাৎ মন্দ হয় না ব্যাপারটা।

কবিরাজের সঙ্গে গাজী সাহেবের পরিচয় অনেকদিনের। মাঝে কিছুদিন উদরীতে পেটে জল হইয়া বিলক্ষণ কষ্ট পাইয়াছেন। সেই সময় পটপটি খাওয়াইয়া কবিরাজ রোগমুক্ত করিয়াছিল তাঁহাকে। সেই জন্য কবিরাজের প্রতি গাজী সাহেব কৃতজ্ঞ হইয়া আছেন। গুটি গুটি পায়ে তিনি বলরাম ভিষকৃরত্নের ডিস্পেন্সারীর দিকে অগ্রসর হইলেন।

বলরাম তখন কিছু পারিবারিক ব্যাপারে বিপন্ন ও বিব্রত হইয়াছিলেন।

মুক্তোকে লইয়া কী করা যায় এখন? আরো বিশেষ করিয়া এই সন্তানের দায়িত্ব। অবাঞ্ছিত এই পিতৃত্বের বোঝা মাথায় করিয়া চলা কোনো মতেই সম্ভব নয়—লোক লজ্জার কথা না হয় না-ই ধরিলাম।

বলরামের চিন্তার মধ্যে অনেকগুলি কবিরাজী ওষুধ ও শিকড়-বাকড় আসিয়া ঝিলিক দিয়া গেল। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া তিনি দেখিলেন মুক্তো বসিয়া অত্যন্ত মনোযোগ দিয়া কাঁথা সেলাই করিতেছে।

বলরাম কহিলেন, ও কী করছ তুমি?

মুক্তোর চোখে ভয়ের ছায়া পড়িল। বলিল, কাঁথা।

—কেন?

মুক্তো জবাবই দিল না।

বলরাম বিছানাটার একপাশে বসিলেন। বলিলেন, ছাখো অনেক ভেবে দেখলাম ওটাকে নষ্ট করে ফলতে হবে। নইলে তোমারও কলঙ্ক—আমারও একটা বিশ্রী—সপ্রতিভভাবে বলরাম একটু হাসিবার চেষ্টা করিলেন।

মুক্তো ভয়ার্ত চোখ মেলিয়া কয়েক সেকেণ্ড তাঁহার দিকে চাহিয়া

রহিল, তাহার হাত হইতে সেলাইটা খসিয়া পড়িল। তারপর সেদিনকার সেই রাত্রির মতোই সে চিৎকার করিয়া উঠিল, না—না!

—না, না? বলরাম হতবাক হইয়া গেলেন: কেন, এতে তোমার আপত্তির কী থাকতে পারে? এ ছাড়া তো উপায় নেই আর। আমার কাছে ভালো ওষুধ আছে, যদি বলো তো আজকেই চেষ্টা করে দেখি। তোমার কোনো—

—না, কিছুতেই নয়। মুক্তো উঠিয়া দাঁড়াইল—যেন বলরামকে স্পষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করিতেছে। বলরাম খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া ব্যাপারটা বুঝিবার চেষ্টা করিলেন, তারপর টাক চুলকাইতে চুলকাইতে পুনর্মূষিক হইয়া বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিলেন।

মুক্তো—নাঃ, মুক্তো দুঃসাধ্য। এমন জানিলে দুদিনের সখের জন্য বলরাম এমন একটা কাণ্ড করিতেন নাকি। বেশ ছিলেন—কিন্তু এখন সামলাও ঠ্যালা! সুখে থাকিতে ভূতে কিলানো আর কাহাকে বলে!

রাধানাথ আসিয়া একখানা চিঠি দিল।

চিঠি? চিঠি আসিল কোথা হইতে? বলরাম চিঠিখানা তুলিয়া লইলেন। হাতের লেখাটা চেনা চেনা ঠেকিতেছে—হাঁ, হরিদাসের চিঠিই তো।

হরিদাস লিখিয়াছেন:

ভায়া হে, জানিয়া নিরাশ হইবে যে আমি মরি নাই। শত্রুর মুখে ছাই দিয়া এখনও বাহাল তবিয়তেই বাঁচিয়া আছি, এক হাঁপানির টান ছাড়া আর বিশেষ কোনো অসুবিধা হইতেছে না।

পথে নদী কিঞ্চিৎ তাণ্ডবীয় নৃত্য দেখাইয়াছে। ডুবাইয়া মারিবার মতলব করিয়াছিল, কিন্তু পারিয়া ওঠে নাই। আমার গৃহিণী বহু

শিবপূজার ফলে আমার মতো ভৃঙ্গীকে পতিরূপে লাভ করিয়াছেন, এত সহজেই তাঁহার বৈধব্য ঘটিবে কেন? তাই আর একবার শুকনা মাটিতে পা দিয়াছি।

ভাবিতেছ, আমি গৃহিণীর মুখ-চন্দ্রমা দর্শন করিয়া মধু-যামিনী যাপন করিতেছি? সেটা ভাবিয়া থাকিলে মহা ভ্রম করিয়াছ। আমি অন্ধকারের জীব—প্যাঁচাই বলিতে পারো, তাই অতটা চন্দ্র-ফন্দ্র আমার তেমন সহ্য হয় না। আমি এখন ঘরে নয়—পথে!

মণিপুর রোড দিয়া হাঁটিতেছি; দু পাশে ঘন জঙ্গলের মধ্যে অতীতের কঙ্কালগুলি ইট পাথরের রূপ লইয়া আমার দিকে তাকাইয়া আছে। বহু দূরে পাহাড়ের গায়ে একটা হাতীর পাল দেখিতেছি—কাছে নয় এইটাই রক্ষা। বুনো ফুলের গন্ধে ভরিয়া আছে বাতাস। ওদিকে কুকীদের কী একটা উৎসব চলিতেছে যেন—বাজনার আওয়াজ কানে আসিতেছে।

পথ চলিয়াছি। কোথায় যাইব জানি না। হয় তো মণিপুর হইয়া বর্মা, তার পরে চীন। তার পরে? তার পরে কোথায় গিয়া থামিব কে জানে? যদি চর ইস্‌মাইলে কখনো ফিরিতে পারি, তাহা হইলে রোমাঞ্চকর অনেকগুলি গল্প শুনাইয়া দিতে পারিব।

তোমার দিন আশা করি ভালোই কাটিতেছে। সেই মেয়েটির কী সংবাদ ইতি—

শ্রীহরিদাস

চিঠিটা পড়িয়া বলরামের মনটা কেমন উদাস আর আচ্ছন্ন হইয়া গেল। হরিদাস—বিধাতার অদ্ভুত সৃষ্টি এই যাযাবর-লোকটা। ঘর নাই, আত্মীয় স্বজন নাই—পৃথিবীকে একমাত্র চিনিয়াছে, আর পথকে।

যে পথ দিয়া যায় সে পথ দিয়া আর কখনো ফেরে না, কিন্তু এমনই দাগ রাখিয়া যায় যে কাহারো সাধ্য নাই তাহাকে ভুলিতে পারে।

এই সময়—এই সময় যদি এখানে হরিদাস থাকিতেন! বলরামের মনে হইল, কেন কে জানে তাঁহার মনে হইল, এই সময় হরিদাস এখানে থাকিলে তাঁহার সমস্ত সমস্যার সমাধান হইয়া যাইত। বলরাম হরিদাসকে সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করিতেন।

—কবিরাজ আছো হে?

বলরামের চমক ভাঙিল। চাহিয়া দেখিলেন, এক মুখ শাদা দাড়ি লইয়া প্রসন্ন মূর্তি মুরুল গাজী দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া।

—আরে গাজী সাহেব যে! আসুন, আসুন, ভেতরে আসুন—বলরাম সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করিলেন: আজ আমার কী সৌভাগ্য যে এখানে গাজী সাহেবের পায়ের ধুলো পড়ল।

গাজী সাহেব সহাস্যে বলিলেন, দেখা করতে এলাম।

ঘরে ঢুকিয়া তিনি ফরাসের উপর বসিতেই বলরাম ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। চিৎকার করিয়া ডাকিলেন, রাধানাথ, ওরে রাধানাথ! গাজী সাহেবকে তামাক দে।

তামাক আসিল। গাজী সাহেব ফরশীতে টান দিয়া বলিলেন, তোমাদের বুড়ো সাহেব তা হলে পাগল হয়ে গেল?

বলরাম নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, তাই তো দেখছি। তবে লোকটা নেহাৎ খারাপ ছিল না।

—না, না, বেশ লোক। গাজী সাহেব সমর্থন করিলেন, একটু রগচটা ছিল তাই যা। ওর নাত্‌নীটাকে বুঝি চুরি করে নিয়ে গেছে?

—সেই কথাই তো শুনেছি।

—হবে, যে পাজী ব্যাটায়া। ওই জাতটাই বদ। যত ভালোই তুমি করো, ঘ্যাচাং ক'রে দা চালিয়ে দেবে গলায়। আমার এলাকায় যত মগ ছিল, সবগুলোকে আমি ভিটেমাটি ছাড়া করে তাড়িয়ে দিয়েছি।

বলরাম কহিলেন, তাই উচিত।

গাজী সাহেব হঠাৎ গলাটা নামাইয়া আনিলেন। বলিলেন, আচ্ছা কবিরাজ, আমাকে একটা ওষুধ দিতে পারো?

—ওষুধ? কী ওষুধ?

গাজী সাহেব দ্বিধা করিলেন, কাশিলেন একটু। কহিলেন, এই যাতে—মানে—জীবনী-শক্তিটা একটু—মানে বাকীটা তিনি চাপা স্বরে বলরামের কানে কানে কহিলেন।

বলরাম হাসিলেন।

বলিলেন, সে তো তৈরী করতে সময় লাগবে। নানারকম জিনিস দিয়ে পাক করতে হবে কিনা। তা তিন-চারদিন বাদে আপনি লোক পাঠাবেন, তারই হাতে দিয়ে দেব না হয়।

গাজী সাহেব প্রসন্ন স্বরে বলিলেন, খরচ যা লাগে—

বাতাসে বলরামের অন্দরের দরজাটা হইতে পর্দা সরিয়া গেল, আর সেই সঙ্গে গাজী সাহেব দেখিলেন মুক্তোকে। চোখের দৃষ্টিটা তাঁহার তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল।

—আচ্ছা কবিরাজ, তোমার বাড়িতে মেয়েদের দেখলাম না? এতদিন তো একাই থাকতে, তা—

গাজী সাহেবের চোখ বলরামের ভালো লাগিল না—বিশেষত মেয়েদের সম্বন্ধে সুখ্যাতি তাঁহার নাই। বলরাম দ্বিধা করিয়া কহিলেন, ও আমার এক দূর-সম্পর্কের—তিন কুলে কেউ নেই, তাই—

—ওঃ তাই।

আর একবার অন্দরের দিকে চোরা চাহনি ফেলিয়া গাজী সাহেব বলিলেন, আচ্ছা আসি তা হলে, আদাব।

—আচ্ছা।

গাজী সাহেব বাহির হইয়া গেলেন। ভারী জুতা আর গলার কড়ির মালার খট্‌খট্ শব্দ মিলাইয়া আসিল দূরে। আর গোটা গোটা অক্ষরে লেখা হরিদাসের পোস্টকার্ডখানা বাতাসে বলরামের পায়ের কাছে উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল শুধু।

চৈতালি

১

[মণিমোহনের ডায়েরী হইতে]

"থাকিয়া থাকিয়া মনে হয় প্রকৃতিটাই একমাত্র সত্য, আর মানুষ এর মাঝখানে প্রক্ষিপ্ত।

প্রক্ষিপ্ত নয় তো কী! তারায় ভরা আকাশ আর ছায়া-ভরা জল লইয়া এই যে পৃথিবী—এর মাঝখানে আমাদের দাবী কতটুকু! দয়া করিয়া যাহা দিতেছে, তাহাই লইতেছি—যাহা দিতেছে না, আপ্রাণ আকাঙ্ক্ষা করিলেও তাহা মিলিবে না। তবু যাহা দিবার তাহাই কি সহজে দেয়! ল্যাবরেটারীর অ্যাসিডের গন্ধ আর বুনসেন বার্নারে অশ্রান্ত সাধনা, কারখানার ডায়নামো আর লোহা-লক্কড় লইয়া তিলে তিলে জীবন পণ করিয়া চলা! তারপরে কৃপণ বর্ষণ। তবুও মনে হয় সব পাইয়াছি।

কী পাইয়াছি। মাথার উপরে নীহারিকা আর নক্ষত্রের জগৎ—রহস্যের তল নাই, কূল নাই, কিনারা নাই। ওদের পংক্তিতে পৃথিবীর আসন কোথায়। শুধু কি ওখানেই? তিন ভাগ জলের মাঝখানে এক ভাগ মাটি জাগিয়া আছে—আর সেই মাটিতে আছে পাহাড়ের শৃঙ্গ—সাহারার মরুভূমি, সাইবেরিয়ার তুষার-প্রান্তর, আর আফ্রিকার কালো অরণ্য। কে কাকে জয় করিয়াছে!

আর মানুষ? মানুষের কয়জনই বা প্রকৃতিকে ছাড়াইতে পারিয়াছে? এক হইয়া আছে তাহারা, জড়াইয়া আছে পরস্পরকে, অবলীন হইয়া

আছে পরস্পরের মধ্যে। আর সেইখানেই তো সত্যিকারের জীবনের রূপ। জীবনকে যদি প্রকৃতির দান বলা যায় তবে প্রকৃতি হইতে জীবনকে তো বিচ্ছিন্ন করা যায় না—তাহার নিয়মের সঙ্গে সঙ্গেই সে যে ঘুরিয়া চলিবে। তাই এই চর ইস্‌মাইলে, এই কালুপাড়ায়—তেঁতুলিয়ার মোহানায় এই সবটা জুড়িয়া মানুষ আর পৃথিবী এক হইয়া আছে।

মানুষ আর পৃথিবী এক হইয়া আছে। মানুষ পৃথিবীর বুদ্বুদ। তবু পৃথিবী লইয়া মানুষ আর মানুষ লইয়া পৃথিবী।

অথচ মানুষ প্রক্ষিপ্ত। শরীর-ধর্মের দিক হইতে নয়। যে মন তাহাকে দিক্ হইতে দিগন্তে, শূন্য হইতে শূন্যান্তরে নব নব অভিযানের পথে লইয়া চলিয়াছে, প্রক্ষেপ তাহার সেই মনে। দেহের মধ্যে মন আসিয়া দ্বন্দ্ব শুরু করিয়াছে। তাই যাত্রা চলিতেছে রকেটের গতিতে আকাশটাকে বিদীর্ণ করিয়া—সৌর জগৎ, নক্ষত্র জগৎ, লাখো কোটি কোটি নীহারিকাকে ছাড়াইয়া।

প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই তো বিঘ্ন। মূলকে ভুলিতে চায়—কিন্তু ভুলিয়া যাওয়া কি সহজ? ইচ্ছা আর দেহ প্রতি পদে পদে পরস্পরকে আঘাত করে—কল্পনা চলিয়া যায় সম্ভাবনার দিকদিগন্ত পার হইয়া, আর দেহ ছড়াইয়া পড়িতে চায় পৃথিবীর সনাতন মৃত্তিকায়।

তবু এই প্রক্ষিপ্ত মনোময় মানুষটা একসময় শরীর-ধর্মের কাছে আত্ম-সমর্পণ করে। তখন ল্যাবরেটারী থাকে না, বয়লারের আগুনের রক্তশিখা তখন মিথ্যা হইয়া যায়। নীহারিকা আর নক্ষত্র-জগতের

স্বপ্ন মিলাইয়া যায় ভাব-বিলাসের মতো। তখন আর মানুষ পৃথিবীকে ছাড়াইতে চ.য় না—পৃথিবীতে লীন হইয়া যায়, জড়াইয়া ধরে তাহাকে কালো অরণ্য, ঝড়ের তুফান, বিদ্যুতের বজ্রজিহ্বা আর অমার্জিত আদিমতায়।

…নিজের কথা ভাবিতেছি।

বর্মী মেয়েটিকে আর দেখিতে পাই নাই। প্রথম প্রথম তাহাকে ভয় করিয়াছিলাম, তাহার চোখের দিকে তাকাইতে সাহস হয় নাই। তারপর সেই ঝড়ের রাত্রি। সে এক অনুভূতি। মনে হইয়াছিল আমার মৃত্যু হইয়াছে—আমার আত্মার, আমার পৌরুষের। একটা বিশ্রী বিস্বাদ একটা কটু তিক্ততা সমস্ত চেতনাকে রাখিয়াছিল আচ্ছন্ন করিয়া।

কিন্তু কদিন হইতে মন চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। আশ্চর্য, আমি সেই বর্মী মেয়েটিকে ভাবিতেছি। তাহার নীল সাপের মতো চোখ, তাহার সেই বাঘের মতো দৈহিক ক্ষুধার্ততা। আমার অলস ভাবনার মধ্যে সে আসিয়া তাহার চিহ্ন আঁকিয়া যায়।

আমার প্রক্ষিপ্ত মন—সভ্যতার আলোকে মার্জিত মন—তাহার কি মৃত্যু হইতেছে? চারিদিকের পৃথিবী প্রতিদিন তাহার জারক-রসে আমাকে লইতেছে জীর্ণ করিয়া? আমি কি অনুভব করিতেছি আমার আদিম সত্তা ধূসর ধরিত্রীতে আমাকে আহ্বান করিতেছে?

সব চাইতে বিস্ময়কর বস্তু এই, আমি কি বর্মী মেয়েকে ভালোবাসিতে শুরু করিয়াছি?”

* * * *

গঞ্জালেস্ অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কথাটা বিশ্বাস করা দূরে থাক, সে যে এখনো তাহা বুঝিয়াই উঠিতে পারে নাই।

কিছুক্ষণ ধরিয়া গঞ্জালেসের চোখেব সামনে খানিকটা হলদে রঙের ধোঁয়া যেন ঘুরপাক খাইতে লাগিল—আর সামনের জগৎটা গেল আচ্ছন্ন হইয়া। মাথা হইতে সমস্ত রক্ত গলিয়া আসিয়া যেন হৃৎপিণ্ডে জমা হইয়াছে, নিশ্বাস ফেলিতেও কষ্ট হইতেছে তার। দুই কানের মধ্যে একটানা একটা তীব্র ধ্বনি-তরঙ্গ—যেন এই দিবা-দ্বিপ্রহরেই প্রচণ্ড রবে ঝিঁঝিঁ ডাকিতে শুরু করিয়াছে।

তারপর আস্তে আস্তে চেতনা ফিরিয়া আসিল তাহার। ডি-সিল্‌ভার কথাগুলি মনের উপর ছুরির দাগের মতো কাটিয়া বসিয়াছিল—এইবার সেই ছুরির দাগ রক্তাক্ত হইয়া আসিল। গঞ্জালেস ধীরে এবং দৃঢ়পদে ডি-সুজার বাড়ীর মধ্যে আসিয়া পা দিল।

ঘরের মধ্য হইতে বাহির হইল বৃদ্ধ ডি-সুজা। বকের পাখার মতো শাদা ভ্রূ-জোড়াকে কপালে তুলিয়া তীক্ষ্ণ চোখে তাকাইল গঞ্জালেসের মুখের দিকে। গঞ্জালেসের মনে হইল সে তাহার দিকেই তাকাইয়া আছে সত্য, কিন্তু সে দৃষ্টি তাহাকে ছাড়াইয়া চলিয়া গেছে বহুদূরে—যেন দূরবীণের কাচের মধ্যে দিয়া সে আকাশের কোনো একটা গ্রহ বা নক্ষত্রকে বৈজ্ঞানিকের মতো পর্যবেক্ষণ করিতেছে।

তারপর বলিল, কে?

তাহার চোখের দৃষ্টি দেখিয়া গঞ্জালেস্‌ও পিছাইয়া আসিল, কিন্তু গাজী সাহেবের মতো চলিয়া গেল না। জবাব দিল, আমি।

—তুমি? তুমি জোহান? শার্টের আস্তিন গুটাইয়া ডি-সুজা দু-এক পা আগাইতে লাগিল, কেন এসেছো এখানে?

—আমি জোহান নই, আমি গঞ্জালেস্।

—গঞ্জালেস্! মিথ্যে কথা। ডি-সুজা চিৎকার করিয়া উঠিল।

তারপর অকস্মাৎ একটা প্রবল অট্টহাসিতে সে ফাটিয়া পড়িল : তুমি ধরা পড়েছ জোহান, ধরা পড়েছ। আমি ঠিক চিনে ফেলেছি তোমাকে।

—সত্যি বলছি আমি জোহান নই, আমি গঞ্জালেস্।

—সত্যি বলছ! হাঃ হাঃ হাঃ—জোহানও সত্যি বলছে আজকাল। এমন হাসির কথা কেউ কখনো শুনেছে নাকি?

এমন হাসির কথা যে বাস্তবিকই কেহ কখনো শোনে নাই, ডি-সুজার ভাব ভঙ্গি দেখিয়া সেটা আর বুঝিতে বাকী রহিল না গঞ্জালেসের। কিছুক্ষণ ধরিয়া সে অকারণে খানিকটা হা-হা করিয়া হাসিল, দন্তহীন মুখের হাসির সঙ্গে সঙ্গে দুর্গন্ধ থুথুর কথা ছিট্‌কাইয়া গঞ্জালেসের চোখে মুখে পড়িতে লাগিল। তারপর কী ভাবিয়া মুহূর্তে অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া গেল।

—আচ্ছা জোহান, তোমার মাথাটা তো ওরা কেটে ফেলেছিল—জোড়া লাগালে কী করে?

গঞ্জালেস্ কী বলিবে ভাবিয়া পাইল না। ডি-সুজা আগাইয়া আসিয়া তাহার গলায় হাত বুলাইতে লাগিল—কেটে ফেললে কি মাথা আবার জোড়া লাগানো যায়?

গঞ্জালেসের মুখের সামনে শোকাচ্ছন্ন উন্মাদ ডি-সুজার টকটকে লাল চোখজোড়া জ্বলিতে লাগিল, গরম নিশ্বাস আসিয়া আগুনের হল্‌কার মতো তাহাকে স্পর্শ করিতে লাগিল।

সেখান হইতে বাহির হইয়া লক্ষ্যহারার মতো চলিতে লাগিল গঞ্জালেস্। পোস্টাপিস পার হইল, খাসমহাল কাছারী ছাড়াইল, তারপর গ্রামের হাট-খোলা পাশে রাখিয়া মুসলমানদের পাড়ার মধ্য দিয়া সে চরের পশ্চিম দিকে আগাইয়া চলিল।

সামনে বিল। বর্ষায় তেঁতুলিয়ার জল আসিয়া বিল আর নদীকে একত্র করিয়া দেয়, তারপর বর্ষার অবসানে ছোট বড় অনেকগুলি বিচ্ছিন্ন জলখণ্ড লইয়া বিলের সৃষ্টি হয়। মাটির নিবিড় স্পর্শে নোনা জল মিঠা হইয়া উঠিয়াছে, শালুক ফোটা শেষ হইয়া গেলেও সমস্ত বিল জুড়িয়া হরিদ্রাভ শালুক পাতা আর গাঢ় সবুজ কলমী শাক লক্ লক্ করিতেছে। ওদিকে দীর্ঘ হোগলা বন, সেই হোগলা বনে এক ধরনের ফল দেখা দিয়াছে। দুটি ছোট ছেলে একখানা সুপারির লম্বা ডোঙায় চড়িয়া হোগলার সেই ফলগুলি সংগ্রহ করিতেছিল। এদিকে একজন লোক একটা টেটা লইয়া ঝুঁকিয়া জলের উপর দাঁড়াইয়া আছে—মাছ পাইলেই বিঁধিয়া ফেলিবে।

গঞ্জালেস্ একটা ঢিবির উপর আসিয়া বসিল। শাদা শাদা মেঘে সারা আকাশটা ছাইয়া আছে, আর সেই আকাশ একটা গম্বুজের মতো বাঁকিয়া দূরে নদীর মধ্যে নামিয়া গেছে। হঠাৎ দেখিলে মনে হইতে পারে, আকাশটা আর কিছু নয়—ওই নদীটাই ওখান দিয়া বাঁকিয়া উঠিয়া মাথার উপর দিয়া বহিয়া গেছে, শাদা মেঘগুলি ঢেউয়ের মতো সূর্যের আলোয় জ্বলিয়া উঠিতেছে। বহু দূরে জলের মধ্যে একদল বুনো হাঁস নির্ভয় ও স্বচ্ছন্দ মনে ভাসিয়া বেড়াইতেছে, বড় বড় পা ফেলিয়া ঝুঁটিওয়ালা বক বিচরণ করিতেছে দলপতির মতো। আর বকেরই বৃহত্তর সংস্করণ তিন-চারিটি বিরাটকায় কঙ্ক বা 'কাঁক' পাখি ফণা-ধরা সাপের মতো এই পক্ষী-তন্ত্রকে পাহারা দিতেছে। সুযোগ পাইলেই ছোঁ মারিয়া বিলের জল হইতে সংগ্রহ করিতেছে পারিশ্রমিক।

গঞ্জালেস্ বসিয়া রহিল। সমস্ত ব্যাপারটা তাহার মনের মধ্যে একটা নিশ্চিত আকার পাইয়াছে এতক্ষণে। লিসিকে ধরিয়া লইয়া গেছে বর্মীরা, ডি-সুজা উন্মাদ পাগল এবং জোহানকে কাহারা মুণ্ড কাটিয়া

নদীর ধারে ফেলিয়া গেছে। আর সেই সঙ্গে গঞ্জালেসের সমস্ত আশা আর কল্পনা সাবানের বুদ্বুদ হইয়া অসীম শূন্যতায় ফাটিয়া পড়িয়াছে।

বুকের হৃৎপিণ্ডে যে রক্তধারা আসিয়া পাথরের মতো জমিয়া গিয়াছিল, সে রক্ত ক্রমে তরলতর ও দ্রুততর হইয়া আসিল। তারপর সে রক্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া আছড়াইয়া পড়িতে লাগিল মস্তিষ্কের মধ্যে। পায়ের তলা হইতে একটা ঘাসের শীষ তুলিয়া লইয়া সে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িতে লাগিল—অকস্মাৎ একটা ঘুমন্ত হিংসা আসিযা তাহার আঙুলের ডগায় যেন আশ্রয় লইয়াছে।

ঝুপ্‌ করিয়া একটা শব্দ হইল। তাহার চোখ পড়িল মৎস্যলোভী লোকটি টেটার বাঁকা ফলাগুলিতে প্রকাণ্ড একটা কুঁচে মাছকে গাঁথিয়া ফেলিয়াছে। মৃত্যু-যন্ত্রণায় মাছটা তুম্‌ড়াইতেছে, ছট্‌ফট্‌ করিতেছে।

গঞ্জালেসের আঙুলে হিংসাটা যেন আরো প্রবল—আরো ভয়ংকর হইয়া উঠিতেছে। তাহার হাত দুইটা কিছু একটা করিতে চায়, যেন কোনো একটা বস্তুকে মোচড়াইয়া পিষিযা ভাঙিয়া না ফেলিলে সে দুইটা আর তৃপ্তি পাইবে না। গঞ্জালেস্‌ নির্মমভাবে ঘাসের শীষ্‌ ছিঁড়িয়া চলিল। ঘাসের মধ্য হইতে একটা চিনে জোঁক মাথা তুলিতেছিল, গঞ্জালেস্‌ টানিয়া আনিল সেটাকে। তারপর দুই আঙলে ধরিয়া সেটাকে ছিঁড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু সেটাকে সহজে ছেঁড়া গেল না—রবারের মতো সেটা বড় হইয়া চলিল, তাহার পিচ্ছিল শিরা-সর্বস্ব দেহটা আঙুলের মধ্যে শির শির করিতে লাগিল। খানিকটা ক্লেদাক্ত নীলরসে গঞ্জালেসের আঙুল চট্‌চট্‌ করিতে লাগিল আঠার মতো।

নখের সাহায্যে গঞ্জালেস্‌ জোঁকটাকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিল।

এতক্ষণে তাহার মনে হইল সিবাস্টিয়ান গঞ্জালেসের উত্তর পুরুষ সে —ডেভিড তাহার পিতা। শক্তির পূজা করিয়াছে তাহারা—বাহুবলকেই একমাত্র পরম সার ও চরম তত্ত্ব বলিয়া জানিয়াছে। নারীর জন্য কখনো তাহারা আরাধনা করে নাই, ক্লান্ত তপস্যায় প্রতীক্ষা করে নাই, ইনাইয়া বিনাইয়া প্রেমের প্রলাপ বলিতেও তাহারা অভ্যস্ত নয়। তাহাদের কাছে নারীর মূল্য একান্ত দেহগত—ছিনাইয়া আনিলেই যথেষ্ট। প্রয়োজন ফুরাইয়া গেলে উচ্ছিষ্ট পাত্রের মতো দূরে ফেলিয়া দিতেও তাহারা কুণ্ঠা বোধ করে নাই কোনোদিন। ডেভিডের জীবনে কত নারী আসিয়াছে গিয়াছে—তাহার মতো লিসিকে হারাইয়া বুক চাপড়াইয়া কখনো কাঁদিতে হয় নাই তাহাকে।

কিন্তু গঞ্জালেস্! আজ হঠাৎ একটা তীব্র ধিক্কার আর অপমান-বোধে বিষাক্ত হইয়া গেল তাহার মন। গঞ্জালেস্ নিজের অমর্যাদা করিয়াছে, বংশধারার অপমান করিয়াছে, চরম অসম্মান করিয়াছে দিগ্বিজয়ী হার্মাদ-বীর সিবাস্টিয়ান গঞ্জালেসের। কেন সে ছিনাইয়া লয় নাই লিসিকে, কেন সে বাহুবলে তাহাকে আয়ত্ত এবং অংকশায়িনী করে নাই? নিজের জাতিগত গৌরব এবং বিশেষত্বকে অবহেলা করিয়া সে দুর্বলের পথ ধরিয়াছিল, তাই তাহার এই পুরস্কার?

জুতা বাহিয়া আর একটা জোঁক উঠিতেছিল, গঞ্জালেস্ সেটাকে চাপিয়া ধরিল। কোন্ ফাঁকে সেটা গঞ্জালেসের খানিকটা রক্ত খাইয়াছিল কে জানে, সেটাকে ধরিতে কয়েক বিন্দু ঘন রক্ত জুতার উপর ছড়াইয়া পড়িল। আঙুল দুইটা ভরিয়া গেল সেই রক্তে। কয়েক মুহূর্ত সে সেই রক্তের দিকে তাকাইল—মানুষের রক্ত, সব চাইতে উগ্র নেশা!

শুঁটকি মাছের ব্যবসা, চট্টগ্রামের সেই নিরিবিলি নিবাস। কর্ণফুলির কল্লোলে নারিকেল বীথির মর্মর মিশিতেছে। পেরিরা—মদের বোতল। অনুগৃহীতা সেই বাঙালি মেয়েটা।···মুহূর্তে মনে হইল সব কিছু ব্যর্থ আর অর্থহীন। তাহার সমস্ত চেতনাকে মুখরিত করিয়া সমুদ্রের গর্জন বাজিয়া উঠিল,—যেমন করিয়া সাহাবাজপুরের নদীর মুখে ঝঞ্ঝা-ক্ষুব্ধ সমুদ্র সেদিন গর্জন করিয়া উঠিয়াছিল সেই রকম। সেই সমুদ্রের ঘোড়ায় সোয়ার হইয়া যাহারা পৃথিবী জয় করিয়াছে মনের সামনে তাহাদের ছায়ামূর্তিগুলি আসিয়া দেখা দিল। কালো চামড়ার টুপিতে তাহাদের মাথা আর মুখটা ঢাকা—তাহাদের তামাটে কপাল চোঁয়াইয়া শ্রম-ক্লান্ত ঘামের বিন্দু বড় বড় গোঁফ দাড়ির মধ্যে গড়াইয়া পড়িতেছে। শকুনের মতো চোখ মেলিয়া তাহারা নীল চক্রবালে চাহিয়া আছে—কোথাও শাদা পালের এতটুকু আমেজ পাওয়া যায় কিনা। তাহাদের হাতের মধ্যে বন্দুকের কঠিন নল ঘামে ভিজিতেছে, অবিশ্রান্ত লোহার সাহচর্যে তাহাদের হাতেও মরচে পড়িয়া গেছে যেন। ওদিকে 'টারেটে'র উপর তাহাদের পিতলের কামান গলা বাড়াইযা প্রতীক্ষা করিতেছে—মাথার উপর খর্ খর্ করিয়া তাহাদের জাহাজের পাল উড়িতেছে—বাঘের জিভের মতো টকটকে লাল, যেন ক্ষুধার্ত হইয়া সশব্দে লেহন করিতেছে বিরাট শূন্যকে।

গঞ্জালেস্ উঠিয়া দাঁড়াইল। স্থির করিয়া ফেলিয়াছে, দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছে তাহার মন। যেমন করিয়াই হোক, সে ইহার প্রতীকার করিবে, প্রতিষ্ঠা করিবে নিজের পৌরুষকে। যে ভুল তাহার একবার হইয়াছিল, সে ভুলের আর পুনরাবৃত্তি হইতে দিবে না কোনোক্রমেই। আরাকান—আরাকান সে আর কতদূরে। কাজের তাড়ায় সে বহুবার

আরাকান হইতে ঘুরিয়া আসিয়াছে। আর দূর! দূর হইলেই বা ক্ষতি কী। তাহার পূর্বপুরুষেরা সাত সমুদ্র তেরো নদী ডিঙাইয়া অবলীলাক্রমে দেশ-দেশান্তরে চলিয়া গেছে। আর সে এই সামান্য পথটুকু ডিঙাইতে পারিবে না! পৃথিবীর যেখানে থাক, লিসিকে সে খুঁজিয়া বাহির করিবেই।

প্যাঁক্ প্যাঁক্ করিয়া আর্তনাদ, খানিকটা ঝুটাপুটির শব্দ। গঞ্জালেস্ চাহিয়া দেখিল আকাশ হইতে শিকৃরে বাজ ছোঁ মারিয়া একটা হাঁসের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, মৃত্যু-কাতর হাঁসের আর্ত রব বিলের শান্ত আকাশকে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছে।

অসংযত অস্থির হাত দুইটাকে কঠিনভাবে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া গঞ্জালেস্ ফিরিয়া চলিল।

২

জোহানের অপঘাত মৃত্যুর খবরটা তখন থানায় গিয়া পৌঁছিয়াছিল। চৌকীদারের মুখে সংবাদ পাইয়া বিরক্ত দারোগা ব্যাপারটা ডায়েরী করিয়া লইলেন। তারপর গোটা-কয়েক পান আর এক থাবা জরদা মুখে পুরিয়া ক্ষুব্ধ অসন্তোষে কহিলেন, ব্যাটারা আর চাকরী করতে দেবে না। খুন আর জখম, খুন আর জখম। দুটি দিন যেন ঘরে বসে বিশ্রাম করব তার জো-টি নেই। ইংরেজ রাজত্ব কি একেবারে বান্‌চাল হয়ে গেল, না এরা নো-ম্যান্‌স ল্যাণ্ড পেয়েছে? তুই কী বলিস্ রে ব্যাটা।

শেষোক্ত প্রশ্নটি করিলেন তিনি চৌকীদারকে। চৌকীদার কী বলিবে ভাবিয়া পাইল না, দাড়ি চুলকাইয়া বোকার মতো হাসিল এবং শঙ্কিত

হইয়া ভাবিতে লাগিল, সমস্ত ব্যাপারটার পিছনে তাহার সজ্ঞান বা অজ্ঞানকৃত কোনো অপরাধ বিদ্যমান আছে কিনা।

দারোগা আবার বলিলেন, জলপুলিশ কোথায় ?

চৌকীদার কহিল, আজ্ঞে, তাঁরা তো নেই ওদিকে ?

—তা থাকবেন কেন! তাঁরা প্রাণের আনন্দে নৌকো-বিলাস করছেন —সুখের চাকরী তাঁদের। আর আমি সম্বন্ধী দিন নেই রাত নেই—টো টো কোম্পানীর ম্যানেজারী করে বেড়াচ্ছি। নৌকোয় ঘুরতে ঘুরতে সর্দি-কাশি প্রুফ্ হয়ে গেলাম, জল-কাদায় স্রেফ্ ওয়াটার প্রুফ্। আর ঘোড়া আর সাইকেল দাব্ড়ে হার্নিয়া হয়ে গেল। ছেড়েই দেব এই কচুপোড়ার চাকরী, দেশে গিয়ে জমিতে লাঙল ঠেললে এর চাইতে অনেক বেশি কাজ দেবে।

লাঙল ঠেলিলে অবশ্য ভালোই হয়, কিন্তু তা সত্বেও চাকরীর মায়াটা দারোগা কাটাইতে পারিলেন না। মুখে যত গর্জনই করুন, ধরা-চূড়া পরিয়া বাহির হইয়া পড়িতে হইল। খুনের মামলা, সংবাদ পাওয়া মাত্র ছুটিতে হইবে, এক মুহূর্ত বিলম্ব করিলে চলিবে না।

নৌকাতেও দেড় দিনের পথ। যাতায়াত তিনদিন। দুজন কন্স্টেবল লইয়া দারোগা যখন চর ইস্মাইলে আসিয়া দর্শন দিলেন, জোহানের কবন্ধ দেহটা পচিয়া তখন এমন উৎকট দুর্গন্ধ ছাড়িতেছে যে তাহার এক মাইলের মধ্যেও আগানো যায় না। অসংখ্য শাদা পোকা সর্বাঙ্গে কিলবিল করিতেছে, কালো রস গড়াইতেছে নিরবচ্ছিন্নভাবে। চৌকীদার পাহারার বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছিল বলিয়াই শেয়াল কুকুরে খাইতে পারে নাই। পচা চামড়ায় পোড়া তামার রং।

কিন্তু দারোগা এতটুকু দ্বিধা করিলেন না, একবারও নাসাকুঞ্চন

করিলেন না। সেই দুর্গন্ধ বিকট বস্তুটাকে পা দিয়া বারকয়েক নাড়াচাড়া করিলেন, তারপর সেটাকে চালান দিবার হুকুম দিয়া রহমতুল্লা সরকারের বাড়ির দিকে যাত্রা করিলেন। রহমতুল্লা এখানকার ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট। কালে-ভদ্রে সরকারী মহিমান্বিত ব্যক্তিরা এ অঞ্চলে পদার্পণ করিলে তাঁহার আতিথ্যই লইয়া থাকেন। রহমতুল্লা নুরুল গাজীর চাচাতো ভাই—তবে একটু বেশি সরকার ঘেঁষা বলিয়া নুরুল গাজী তাঁহাকে এড়াইয়া চলেন।

জবানবন্দি দিতে ডাকা হইল ডি-সিল্‌ভাকে। ডি-সিল্‌ভা এলো-মেলো ভাবে যাহা মনে আসে বলিয়া গেল এবং দারোগা তাঁহার ইচ্ছামতো যাহা খুশি তাহাই টুকিয়া লইলেন। রহমতুল্লার রান্নাঘর হইতে তখন হাঁড়ি কাবাবের চমৎকার গন্ধ আসিতেছিল এবং দারোগা ক্ষুধার্ত বোধ করিতেছিলেন। তা ছাড়া সন্ধ্যার মধ্যেই ফিরিতে হইবে, রাত্রি ঘনাইয়া আসিলে এদেশের নদীনালায় পুলিশের লোকেও নিজেদের নিশ্চিন্ত এবং নির্ভীক বলিয়া বোধ করে না।

শহরে লইয়া গিয়া সেই বিকৃত গলিত দেহটাকে ডাক্তারি পরীক্ষার পরে পুঁতিয়া ফেলা হইল। দারোগা থানায় বসিয়া পান আর জরদা চিবাইতে চিবাইতে লম্বা-চওড়া দেখিয়া একখানা রিপোর্ট উপরে দাখিল করিলেন, তাহাতেই মিটিয়া গেল ব্যাপারটা। চরের ক্রিমিন্যাল এলাকায় এ সমস্ত জিনিস তো হামেসাই ঘটিতেছে, ইহা লইয়া বেশি নাড়াচাড়া করিতে গেলে বিশ্রাম লইবার জো থাকে না পুলিশের।

অতএব এই গল্প হইতে জোহানের দাবী মিটিয়া গেল। তাহার আশা, তাহার কল্পনা, লিসিকে লইয়া ভিজাগাপত্তনে সেই ঘর বাঁধিবার স্বপ্ন—জীবনের সঙ্গে সঙ্গে সবই নিঃশেষে নির্বাপিত হইয়া গেল। তাহার

এক দূর-সম্পর্কের মাসী—যে তাহার ঘর আগলাইয়া থাকিত, কিছুদিন সে কাঁদা-কাটা করিল, তারপর একদিন নদী পার হইয়া চলিয়া গেল কোথায়। জোহানের ভাঙা-ভিটা ঘিরিয়া জঙ্গল গজাইতে লাগিল, গর্ত্ত খুঁড়িয়া সাপ আর ইঁদুর বাসা করিল—তারপর চর ইস্‌মাইলের মন হইতে ক্রমে ক্রমে নিশ্চিহ্ন ভাবে মুছিয়া গেল তাহার স্মৃতি। ভাঙন লাগিয়া মেঘনার মোহনায় ফলে শস্যে সমুজ্জ্বল উপনিবেশ তলাইয়া গেল, আবার নতুন করিয়া মাথা তুলিল নূতন উপনিবেশ—নব সূর্যালোকে, নবতম মানুষের পদপাতের রোমাঞ্চিত সম্ভাবনায়।

৩

ডি-সুজার হাবভাব দেখিয়া গাজী সাহেব শঙ্কিত হইয়া ছিলেন। যে ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহাতে বিকৃত-মস্তিষ্ক ডি-সুজা হয় তো পুলিশের কাছে সমস্ত ঘটনাটা প্রকাশ করিয়া দিবে—কেঁচো খুঁড়িতে গিয়া সাপ বাহির হইয়া পড়িবে অবশেষে। আফিঙের ব্যবসার খবরটা একবার বাহির হইয়া গেলে কিছু আর করিবার থাকিবে না, দীর্ঘকাল শ্রীঘর বাস অনিবার্য। এ তো আর পুলিশের সাধারণ ব্যাপার নয় যে দারোগা ইন্‌সপেক্টারের পকেট ভারী করিয়া দিলেই চলিবে।

কিন্তু ডি-সুজা বাহিরে জিনিসটাকে একেবারেই যে প্রকাশ পাইতে দিল না, ইহাতে গাজী সাহেব অতিশয় আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিলেন। এমন কি, এ কথাও তাঁহার মনে হইল যে লোকটার জন্যে কিছু করিতে পারিলে মন্দ হইত না। বুড়ো সাহেবের কাছে নানা দিক হইতেই তিনি ঋণী।

এখানে গাজী সাহেবের কিছু বিস্তৃত পূর্বপরিচয় দেওয়া চলিতে পারে।

খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে মুসলমান ক্ষাত্র-শক্তির প্রচণ্ড আঘাত আসিয়া পড়িল। দাক্ষিণাত্য-সমাগত সেন-বংশের রাষ্ট্রিক কাঠামোতে তখন ঘুণ ধরিয়াছে ; হিন্দু-ধর্মের নবীন অভ্যুত্থানের দোহাই দিয়া বৌদ্ধ সংপ্রদায়ের উপর চরম অত্যাচার চলিতেছে, লৌকিক সংস্কারের কঠিন নাগপাশে জাতির শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধপ্রায় এবং কামতন্ত্রতার প্রশ্রয়ে রাজসভায় রসের স্রোত বহিতেছে। ক্ষত্রিয়ের চারণ-গাথা লোপ পাইয়াছে গীতগোবিন্দের ললিত-মধুর-কোমল-কান্ত 'পদাবলীতে' এবং পরকীয়া প্রেমে সুদক্ষ রাজার গৌরব-গাথা তাম্রশাসনে অবিনশ্বর কণ্ঠে কীর্তিত হইতেছে।

এমনি সময় মুসলমান শক্তির সংঘাতে গৌড়ের রাজ-সিংহাসন ধুলায় মিলাইয়া গেল। রাজা পলাইয়া আত্মরক্ষা করিলেন। বাধ্যতামূলকভাবে একদল হিন্দুকে মুসলমানধর্ম গ্রহণ করিতে হইল, একদল বৌদ্ধ হিন্দুদের দুর্ব্যবহারের প্রতিশোধ লইবার জন্য স্বেচ্ছায় মুসলমান হইয়া গেল। উত্তর ও মধ্য বঙ্গের বিচূর্ণ দেবালয়গুলির পাথর লইয়া মস্‌জিদ তৈয়ারী হইল, দীঘির শীতল কাদার মধ্যে পলাতক পাষাণ-দেবতা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া অজ্ঞান-তন্দ্রায় বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

পূর্ববঙ্গ—আরো বিশেষ করিয়া সমুদ্রের একেবারে কোল ঘেঁষিয়া এই যে অঞ্চলগুলি, ইহারা তখন সদ্যোজাত ক্লেদাক্ত শিশুর মতো জল-কাদা আর জঙ্গল মাথা তুলিতেছিল। প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীর সঙ্গে তুলনা চলিতে পারে। বনে হিংস্র জন্তু, জলে কুমীরের বিচরণ, ঝোপে জঙ্গলে বিষাক্ত সাপের সমুদ্যত ফণা······উত্তর ও মধ্যবঙ্গ হইতে পলাতক একদল হিন্দু জমিদার পূর্ব বাংলার এই সমস্ত দুর্গম স্থানে আসিয়া আশ্রয়

লইলেন—প্রকৃতি পরম যত্নে দুর্গের মতো তাহার নানা প্রতিকূলভাব প্রাকার তুলিয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে লাগিল। কিছুদিন এইভাবেই কাটিল। তার পর দেখিতে দেখিতে প্রাগৈতিহাসিক অরণ্যরাজ্য বর্তমানের গণ্ডিতে আসিয়া পা দিল, জল কাদা শুকাইল, বন জঙ্গল সমুদ্রের দিকে সরিতে লাগিল, হিংস্র জন্তুরা পথ করিয়া দিল মানুষকে। উত্তরবঙ্গবিজয়ী মুসলমানের তরবারি পূর্ববঙ্গের আকাশেও বিদ্যুৎশিখায় ঝল্‌সিয়া উঠিল।

মুসলমান রাজারাই যে কেবলমাত্র তখন দিগ্বিজয় করিয়া বেড়াইয়াছিলেন তাহা নয়। একদল ধর্মোন্মত্ত ফকির এই ভারটি গ্রহণ করিলেন। বিধর্মীদের ইসলামের ছত্র-ছায়ায় আনিয়া তাহাদের কল্যাণ-সাধন, ইহাই ছিল ফকিরদের ব্রত। কিন্তু ফকিরেরা বৌদ্ধ বা বৈষ্ণবদের মতো অহিংস ছিলেন না—তাঁহাদের কোরাণ আর তরবারি পাশাপাশি চলিত। বাহুবলে তাঁহারা অবিশ্বাসী কাফের জমিদারদের পরাভূত করিয়া ইস্‌লামের দীক্ষা দিতেন। পূর্ববঙ্গে তাঁহাদের কীর্তি-কলাপের সীমা-সংখ্যা নাই। নিম্ন বাংলার দুর্গমতম স্থলেও অভিযান করিয়া এই ফকিরেরা যেভাবে তাঁহাদের ব্রত পালন করিয়াছেন—একমাত্র আফ্রিকার অরণ্যবাসীদের মধ্যে খৃস্টানধর্ম প্রচারকারী মিশনারীদেরই সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে। বাংলা দেশের মুসলমান সংখ্যাধিক্যের বিরাট কৃতিত্ব বহু পরিমাণে এই ফকিরেরাই দাবী করিতে পারেন।

এই অসিধারী ফকিরেরাই সে যুগে গাজী নামে পরিচিত ছিলেন। ইঁহারা কেহ কেহ নিজেদের অসীম শক্তি ও অলৌকিক ক্ষমতার বলে পীরত্ব বা দেবত্ব লাভ করিয়াছেন। নিম্ন বঙ্গে হিন্দু দেবতা ব্যাঘ্রাচার্য দক্ষিণ রায়ের সহিত সমানভাবেই মুসলমানের পীর কোনো এক বড় খাঁ

গাজীকে পূজা করা হয়। প্রচলিত মঙ্গল কাব্য ও লৌকিক সাহিত্যে দক্ষিণ রায়, কালু রায়, বড় খাঁ গাজী এবং মহিলা বনবিবির কীর্তিকথা বর্ণিত হইয়াছে। সে-সব কাহিনীতে রূপকথার খাদ আছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহাতে প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে বিস্মৃত যুগের এক অপূর্ণ অথচ অপূর্ব সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ইতিহাস।

নুরুল গাজী ইঁহাদেরই কাহারও বংশধর।

নুরুল গাজীর ঊর্ধ্বতন পিতৃপুরুষ যখন ধর্মপ্রচারার্থ এদেশে আসিলেন, তখন স্বরূপ রায় নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত জমিদার এদেশে কোথাও রাজত্ব করিতেন। তাঁহার প্রচুর সৈন্যসামন্ত ছিল, বিচক্ষণ মন্ত্রী এবং সেনাপতি ছিলেন, অস্ত্র-শস্ত্র-হাতীঘোড়া ছিল এবং সর্বোপরি স্বরূপ রায় দুর্দান্ত বীর ছিলেন। তাঁহার নামে নিম্নবঙ্গ তখন তটস্থ থাকিত।

নুরুল গাজীর পিতৃপুরুষ সিকন্দর গাজী প্রচুর সেনা লইয়া স্বরূপ রায়ের রাজ্য আক্রমণ করিলেন; কিন্তু স্বরূপ রায়ের দুর্ধর্ষ বাহিনীর কাছে সিকন্দর গাজীর সৈন্য দাঁড়াইতে পারিল না, স্রোতের মুখে কুটোর মতো ভাসিয়া গেল তাহারা। বার বার তিনবার। রক্তে নদী বহিল, শবদেহে পাহাড় জমিল, স্বরূপ রায় নিজে যুদ্ধে আহত হইলেন, তবুও তাঁহার শক্তিক্ষয় হইল না।

উপায়ান্তর না দেখিয়া গাজী তাঁহার অলৌকিক শক্তির আশ্রয় লইলেন। তিনি কী মন্ত্র প্রয়োগ করিলেন কে জানে, আশে পাশের জঙ্গলে যেখানে যত বাঘ ছিল, তাঁহার মন্ত্রের আঘ্রাণে পিল্ পিল্ করিয়া সুবোধ বালকের মতো গাজীর সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। ইহাদের লইয়া তিনি এক অভিনব সৈন্যদল রচনা করিলেন এবং পুনরায় বীরদর্পে স্বরূপ রায়ের রাজ্য আক্রমণ করা হইল।

স্বরূপ রায়ের সৈন্যেরা মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেই অভ্যস্ত, রণক্ষেত্রে বাঘের আবির্ভাব দেখিয়া তাহাদের আত্মাপুরুষ খাঁচাছাড়া হইয়া গেল। সুন্দরবনের ডোরা-কাটা হলুদবর্ণের সমস্ত কেঁদো বাঘ—ভাঁটার মতো চোখগুলি পাকাইয়া হুঙ্কার করিয়া অগ্রসর হইতেছে, এ দৃশ্য দেখিয়া তাহাদের আর যুদ্ধ করিবার মতো মনের জোর অবশিষ্ট রহিল না।। অস্ত্রশস্ত্র ফেলিয়া যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিল। স্বরূপ রায়ের সেনাপতি বিক্রম পাল নাকি বর্মচর্ম লইয়া বাঘ মারিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন কিন্তু তিন-চারিটি কেঁদো বাঘ একসঙ্গে পড়িয়া মুহূর্তে ঢাল-তরোয়াল সমেত তাঁহাকে রসগোল্লার মতো ফলার করিয়া ফেলিল।

অতএব একরকম বিনাযুদ্ধেই সমাপ্ত হইল বিজয়-পর্বটা। স্বরূপ রায় সপরিবারে ইস্লাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। সিকন্দর গাজী স্বরূপ রায়ের একটি সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করিয়া খুলনা জেলার নিম্নাঞ্চলে মুসলমান ধর্ম প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ধর্মান্তরিত বৌদ্ধের দল এবং গাজীদের তরবারি বাংলার শেষ হিন্দুশক্তিকেও লুপ্ত করিয়া দিল।

তাঁহারই উত্তর পুরুষ নুরুল গাজী কেমন করিয়া এখানে আসিয়া বাসা বাঁধিলেন, সে ইতিহাস স্বতন্ত্র। নূতন জাগা চরের ইজারা লইয়া তাঁহার পিতামহ প্রথম এদেশে আসেন। সেই হইতেই গাজী সাহেবেরা স্থায়ীভাবে এখানে বসবাস এবং ব্যবসা করিয়া আসিতেছেন।

দিগ্বিজয়ীর বংশধর বলিয়াই বোধ করি, গাজী সাহেবের সঙ্গে ডি-সুজার হৃদ্যতাটা এত জমাট হইয়া উঠিয়াছিল। তারপর সে বন্ধুত্বটা আরো প্রগাঢ় হইল, যখন দুইজনেই একটি ব্যবসায়ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইল। বন্ধুত্ব ও বিশ্বাসের চরম অধ্যায়।

গাজী সাহেবের কাজ অবশ্য একটা নয়। চরে জমিদারীটা তাঁহার

উপলক্ষ্য মাত্র। সুযোগ পাইলে লোক নামাইয়া তিনি এখনো নদীতে ডাকাতি করান। তা ছাড়া পূর্বপুরুষের বৈশিষ্ট্যটাও একেবারে বিসর্জন দেন নাই তিনি। উপরের দিক হইতে কেহ নারীঘটিত ব্যাপার করিয়া পলাইয়া আসিলে গাজী সাহেব তাহাকে আশ্রয় দিয়া থাকেন। তারপর রাতারাতি মেয়েটাকে ইস্‌লামে দীক্ষিত করেন—পুলিশ সন্ধান না পাইলে ভালোই, পাইলেও সেটাকে ফাঁসাইয়া দিতে তিনি জানেন।

দিনকয়েক বাদে গাজী সাহেব আবার চর ইস্‌মাইলে আসিলেন। ডি-সুজার এখনও কোনো পরিবর্তন নাই, তাহার মাথা তেমনি অসংলগ্ন হইয়া আছে। দূর হইতেই একটা সহানুভূতির নিশ্বাস ফেলিয়া আজও তিনি সেখান হইতে চলিয়া আসিলেন। একবার কবিরাজের সঙ্গে দেখা তাঁহার করিতেই হইবে। সে ওষুধটা না হইলে কোনমতেই চলিতেছে না। বয়স ষাট হইয়া গেছে, তবু গাজী সাহেব আরো অনেক বেশি বাঁচিতে চান, সতেজ সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য লইয়া জীবনকে উপভোগ করিতে চান একান্ত ভাবে।

কবিরাজকে কিন্তু বাড়ীতে পাওয়া গেল না। রাধানাথ বাহিরের রোয়াকে একটা মাদুর পাতিয়া নির্জন দুপুরে নিশ্চিন্ত নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছিল। তাহার হাঁ-করা মুখের একপাশ দিয়া লালা গড়াইয়া ওয়াড়হীন তেলচিটচিটে কালো বালিশটার উপর পড়িতেছিল; আর তাহারি গন্ধে নিমন্ত্রিত একপাল মাছি ঢুকিয়া পড়িয়াছিল তাহার উন্মুক্ত মুখ-গহ্বরের মধ্যে—যেন অভিযাত্রীর কৌতূহল লইয়া রহস্যপুরীর তথ্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করিতেছিল।

গাজী সাহেবের জুতা আর কড়ির মালায় খট্‌খট্‌ শব্দে রাধানাথের তন্দ্রা ভাঙিল। কপাৎ করিয়া হাঁ-করা মুখটা সে বুজিয়া ফেলিল, আর

সেই সঙ্গে আট-দশটা অনুসন্ধিৎসু মাছিকেও উদরসাৎ করিল সম্ভবত। একহাত দিয়া মুখের দুর্গন্ধ লালাটা মুছিয়া লইয়া সে তন্দ্রাজড়িত রক্তবর্ণ চোখ মেলিয়া চাহিল। তারপর সসম্ভ্রমে কহিল, গাজী সাহেব যে! আদাব আদাব।

গাজী সাহেব দাড়ি-গোঁফের ভিতর হইতে নীরবে একটু হাসিলেন। রাধানাথ জিজ্ঞাসার আগেই সংবাদটা জানাইয়া দিল, বাবু নেই তো বাড়ীতে।

—কোথায় গেছেন?

—ওপারে, রুগী দেখতে। সন্ধ্যার পরে ফিরবেন।

—আমি তা হলে চললুম—গাজী সাহেব যাইবার জন্য পা বাড়াইলেন। বলরামের ভৃত্য, অতএব স্বাভাবিকভাবে মনিবের মতো কতকগুলি গুণও আয়ত্ত করিয়াছে রাধানাথ। আপ্যায়নের ত্রুটি সে-ও করিল না। বলিল, বসুন না, তামাক সেজে দিই—

—না বসব না। কবিরাজ এলে খবর দিয়ো আমি এসেছিলুম—গাজী সাহেব চলিয়া গেলেন।

রাধানাথ বড় করিয়া একটা হাই তুলিল, তারপর একটা বিড়ি ধরাইয়া আবার যথাস্থানে চিত হইয়া শুইয়া পড়িল। দিব্যি মিঠা বাতাস আসিতেছে—দিবা-নিদ্রাটি ভারী জমিয়া উঠিয়াছিল। মাঝখান হইতে গাজী সাহেব আসিয়া কাঁচা ঘুমটুকুকে মাটি করিয়া দিয়া গেল।

মধ্যরাত্রির মতো নিস্তব্ধ প্রশান্ত দুপুর। উষ্ণমণ্ডলের সূর্য মাথার উপরে জ্বলিতেছে প্রবলভাবে—আকাশটা পুড়িয়া যেন খাক্ হইয়া যাইবে। নীল আকাশটা অদ্ভুতভাবে নীল—এই অতিরিক্ত নির্মলতাকেই অত্যন্ত সন্দেহজনক মনে হয় এখানে। এমন এক একটি দিনেই কাল-বৈশাখীর আবির্ভাব ঘটে।

তেঁতুলিয়ার জলকণা লইয়া স্নিগ্ধ হাওয়া আসিতেছিল। মাথার উপর সুপারির পাতাগুলি খস্ খস্ শব্দে কাঁপিতেছে, পাখীর ঠোকর লাগিয়া একটা পাকা সুপারি পায়ের কাছে আসিয়া পড়িল। আর সেই সময় হঠাৎ চোখ তুলিয়া চাহিতেই গাজী সাহেব আর একবার মুক্তোকে দেখিলেন। আপনা হইতেই তাঁহার পা দুটি থামিয়া আসিল, দৃষ্টি আটকাইয়া রহিল দুর্লভ-দর্শন একটি অপূর্ব নারীমূর্তির দিকে।

সুপারিবনের একপাশে একটা ডোবা। সম্মান করিয়া পুকুর বলা চলিতে পারে। অনেকটা জায়গা লইয়া বলরামের বাড়ী আর বাগান, কাজেই ডোবাটাকে মোটামুটি নিরিবিলি ও নিভৃত বলিয়া মনে করিলে দোষ হয় না। তাই মুক্তো ঘাটে বসিয়া কী যেন করিতেছিল।

দূর হইতে অতৃপ্ত চোখে গাজী সাহেব তাহাকে দেখিতে লাগিলেন। আঁচল খসিয়া-পড়া অনাবৃত পিঠের উপর কালো চুলের রাশি ছড়াইয়া আছে, অসতর্ক বেশ-বাসে সৌন্দর্য উদ্ঘাটিত। চকিতের মতো সেদিন তিনি তাহাকে দেখিয়াছিলেন, আজ নির্নিমেষ দৃষ্টিতে ভালো করিয়া পর্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহার মনে হইল মেয়েটি সত্যিই সুন্দরী।

কে এ? বলরামের স্ত্রী নয় নিশ্চয়ই—অন্য কোনো আত্মীয়া হইলে এই দূরদেশে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে বসবাস করিতে কেন রাজী হইবে? তবে কি—

মুহূর্তে ব্যাপারটার সমাধান হইয়া গেল। বলরাম সাধু সাজিয়া থাকে বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে এতটা শুদ্ধ সংযত কিছু নয়। সঙ্গে সঙ্গেই একটা প্রত্যাশাতে যেন গাজী সাহেবের মনটা পূর্ণ হইয়া উঠিল। বলরাম যখন পাইয়াছে, তখন তাঁহার পক্ষেও খুব দুষ্প্রাপ্য হইবে না হয় তো। তা ছাড়া বলরাম অপেক্ষা তিনি সর্বাংশে যোগ্য ব্যক্তিও বটেন।

চোখের দৃষ্টিতে বোধ হয় চুম্বকের মতো কী একটা ব্যাপার আছে। মুক্তো এক সময় পিছন ফিরিয়া তাকাইল এবং সঙ্গে সঙ্গেই জ্বলন্ত ছুটি ক্ষুধার্ত চক্ষুর সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎকার হইয়া গেল।

মুক্তো চমকিয়া উঠিল। চকিতে নিজেকে সংযত করিয়া লইল, তারপর প্রকাণ্ড একটা ঘোমটা টানিয়া দিল মাথার উপর। গাজী সাহেব একবার চারিদিকে তাকাইলেন—কোনোখানে জনপ্রাণীর সাড়া-শব্দ কিছুই নাই। বাতাসে কেবল সুপারির পাতা কাঁপিতেছে।

গাজী সাহেব হাসিলেন, ইঙ্গিতপূর্ণভাবে দু-একবার কাশিলেনও। মুক্তো কী ভাবিল কে জানে, ঘোমটার ভিতর হইতে তাঁহার দিকে চকিত দৃষ্টিক্ষেপ করিয়াই তড়িৎবেগে তিরোহিত হইল। গাজী সাহেবদাঁড়াইয়াই রহিলেন।

বলরামের ফিরিতে রাত হইয়া গেল। গীর্জার ঘাটে আসিয়া যখন তিনি নৌকা ভিড়াইলেন, তখন রাত বারোটার ওপরে গড়াইয়া গেছে। নৌকাব মাঝি আলো ধরিয়া তাঁহাকে আগাইয়া দিল। এইখানেই কয়েকদিন আগে জোহান খুন হইয়াছেন, কবিরাজের গায়ের মধ্যে ছম্ ছম্ করিতে লাগিল।

বাহিরের ঘরের দরজাটা খোলাই ছিল—রাধানাথ খুলিয়া রাখিয়াছে। একটা লণ্ঠন জ্বলিতেছে মিট্ মিট্ করিয়া। দেওয়ালে চীনা মেয়ের ছবি বাতাসে দোল খাইতেছে।

শাদা জিনের কোটটা খুলিয়া এবং পায়ের লাল কেড্‌স জোড়াকে একপাশে রাখিয়া বলরাম নিজের ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। বিছানাটা পরিপাটি করিয়া পাতা—মাথার কাছে একটা বড় ঘটি এবং

একগ্লাস জল কেরোসিনের কাঠের একটা টেবিলের ওপর বসানো রহিয়াছে। মুক্তোর হাতের স্পর্শ। সাংসারিক ভাবে মুক্তোর অস্তিত্ব সম্পর্কে ভুল করিবার কোনো কারণ নাই। রান্না-বান্না হইতে শুরু করিয়া তাঁহার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রয়োজনটুকুও সে যেন আগে হইতেই বুঝিয়া রাখে, কখনো এতটুকু অভিযোগ করিতে হয় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আজ সে কতখানি দূরে সরিয়া গেছে। অত্যন্ত কাছে টানিতে গিয়াই কি বলরাম মুক্তোকে হারাইলেন ?

নৌকায় আসিতে আসিতে অনেক কথাই তাঁহার চিন্তার মধ্য দিয়া আনাগোনা করিয়াছে। আজ বলরাম বুঝিযাছেন মুক্তোকে না হইলে তাঁহার চলিবে না। শুধু শারীরিক ভাবেই নয়---তাহাকে বাদ দিয়া তাঁহার মনও আজ কোনোখানেই দাঁড়াইতে পারিতেছে না। দশ বছর আগে বিপত্নীক হইয়াছিলেন—তারপর এতদিন কাটিয়াছে শান্ত আত্ম-বিস্মৃতির মধ্যে। সংযমী ধীরচিত্ত মানুষ বলরাম, তাই বহুকাল পরে সেই স্থির সংযমে আসিয়া যখন তরঙ্গের দোলা লাগিয়াছে, তখন সেটা কোনমতেই সংযত হইবার নয়।

কিন্তু তাঁহাদের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এই অনাহূত শিশু—এই অবাঞ্ছিত আগন্তক। দুটি অদৃশ্য অথচ দুর্বার বাহু প্রসারিত করিয়া সে বাধা রচনা করিয়া বসিয়া আছে। মুক্তো তাহাকে চায়—বলরাম তাহাকে চান না। তাই বলরামের প্রতি সন্দেহে মুক্তো ব্যাঘ্রীর মতো সতর্ক হইয়া উঠিতেছে বুঝি।

বলরাম বিছানায় আসিয়া আশ্রয় লইলেন, কিন্তু ঘুমাইতে পারিলেন না। সেদিনকার মতো সর্বাঙ্গে অসহ্য উত্তেজনা। চোখের পাতা দুইটা বুজিলেও অন্ধকার আসে না—যেন আগুনের কতকগুলি ফুল সামনে

নাচিতে থাকে। সমস্ত বিছানাটায় যেন বালি কিচ্ কিচ্ করিতেছে। বলরাম উঠিয়া বসিলেন।

মুক্তো আজকাল দরজায় খিল দিয়াই ঘুমায়। তা হোক। বলরাম জানেন একটু চেষ্টা করিলেই ও-ঘরের দুটি কবাটের জোড় অনেকখানি ফাঁক হইয়া যায় আর সেই ফাঁকের ভিতর দিয়া খিল খুলিয়া ফেলা চলে সহজেই। যা হওয়ার হোক—এই আত্মনিপীড়ন অসহ্য।

বাহিরে অন্ধকারে প্যাঁচা ডাকিতেছে—নিম্-নিম্-নিম্। প্যাঁচার ওই ডাকটার সম্বন্ধে এদিককার লোকের কেমন একটা কুসংস্কার আছে —ওরা নাকি মৃত্যুর সংবাদ বহন করিরা আনে। কাহাকেও লইয়া যাইবার মতলবে আসিয়াছে, নিম্-নিম্ করিয়া সেই কথাটারই জানান দিতেছে। চর ইস্‌মাইলের চারদিক ঘিরিয়া তেঁতুলিয়ার অতন্দ্র কল্লোল জাগিয়া আছে—আর থাকিয়া থাকিয়া কুকুরের অর্থহীন চিৎকার।

একটা টর্চ লইয়া বলরাম বাহিরে আসিলেন। রাধানাথ নাক ডাকাইতেছে—কটকটে ব্যাঙের ডাকের মতো বিশ্রী একঘেয়ে আওয়াজ। পাণ্ডুর জ্যোৎস্না দেখা দিয়াছে, তাহারি আলোয় বলরামের নিজের ছায়াটা যেন প্রেতমূর্তির মতো অতিশয় দীর্ঘ হইয়া বারান্দার উপর ছড়াইয়া পড়িল। নিজের ছায়া দেখিরা তাঁহার নিজেরই ভয় করিতেছে যেন। প্যাঁচাটা ক্রমাগত শাসাইয়া চলিয়াছে—নিম্-নিম্-নিম্।

বলরাম মুক্তোর ঘরের খিল খুলিয়া ফেলিলেন। মুক্তোর ঘুম আজকাল যেন আগের চাইতে ঢের বেশি বাড়িয়া গেছে। সেদিনের মতো বলরাম আজো আসিয়া আবার তাহার বিছানার পাশে দাঁড়াইলেন।

···মুক্তো উঠিয়া বসিল, এক ধাক্কায় বলরামকে ঠেলিয়া তিন-চার

হাত দূরে ফেলিয়া দিল। তারপর পশুর মতো একটা আর্তনাদ করিয়াই টলিতে টলিতে ঘর হইতে দ্রুত বাহির হইয়া গেল। যেন পলাইতে চায় —পলাইয়া রক্ষা করিতে চায় নিজেকে। সজোরে এবং সশব্দে কবাটটাকে খুলিয়া অন্ধকারের মধ্যে নামিয়া গেল সে।

আর পরক্ষণেই পতনের শব্দ আর সেই সঙ্গে তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার ভাসিয়া আসিয়া যেন বলরামের কানের মধ্যে বিঁধিয়া গেল।

নিজের মূঢ়তাকে সাম্‌লাইয়া লইয়া বলরাম তড়িৎ বেগে বাহিরে আসিলেন। বেশি দূর আসিতে হইল না—পাণ্ডুর চাঁদের আলোয় দেখা গেল একেবারে দাওয়ার সম্মুখেই কী একটা শুভ্র বস্তু মাটিতে পড়িয়া আছে।

বলরাম টর্চ জ্বালিলেন। মাটিতে পড়িয়া আছে মুক্তো। সিঁড়ি দিয়া তাড়াতাড়ি নামিতে গিয়া সামলাইতে পারে নাই—পা ফস্‌কাইয়া আছড়াইয়া পড়িয়াছে। টর্চের আলোয় বলরাম দেখিলেন বড় বড় ক্লান্ত নিঃশ্বাসে তাহার উবুড় হইয়া থুবড়াইয়া পড়া দেহটা থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, আর গল্ গল্ করিয়া নামিয়া আসা কাঁচা রক্তে যেন স্নান করিতেছে সে।

এত করিয়াও মুক্তো তাহার সন্তানকে রাখিতে পারিল না।

৪

কালুপাড়াকে কেন্দ্র করিয়া মণিমোহন আশে পাশে কালেক্‌শন মোটা-মুটি শেষ করিল। পনেরো-বিশটা দিন কাটিয়া গেল অবিশ্রান্ত খাটুনির মধ্যেই। সরকারী লোক এবং তাহার কালেক্‌শন—ইহা ছাড়া জীবনের

আর কোনো রূপ যে থাকিতে পারে, সে কথা ভাবিবারই যেন অবকাশ ছিল না কয়দিন। রাণী নয়, বর্মী মেয়ে নয়, ডায়েরী পর্যন্ত নয়।

কিন্তু এবার ফিরিতে হইবে। বহু টাকা সঙ্গে জমিয়া গিয়াছে, এগুলি কাছারীতে জমা করিয়া দেওয়া দরকার। ওখান হইতে টাকা লইয়া লোক শহরে চলিয়া যাইবে। এতগুলি টাকা সঙ্গে লইয়া নদীতে ঘুরিয়া বেড়ানো বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না। অভাবে অভিযোগে দেশের লোক কুকুরের মতো হন্যে হইয়া আছে—সরকারী বাবুকেও রেয়াত করিতে রাজী হইবে না তাহারা।

এত ধান—প্রকৃতির এমন দাক্ষিণ্য—এমন অপরিমিত ঐশ্বর্য। তবুও দুর্ভিক্ষ চলে। ডাকাতি কেবল লোকে যে স্বভাবের দিক হইতে করে তা নয়, অভাবের প্রশ্নটাও সমান জটিল এবং নির্মম। পটুয়াখালি এলাকায় কয়েকখানা ধানের নৌকা লুট হইয়াছে। তা ছাড়া উপনিবেশের এই দুর্জয় মানুষের দল। একবার যদি কোনোক্রমে জানিতে পারে যে, মণিমোহন এই রাশি রাশি কাঁচা টাকা লইয়া নিশীথ রাত্রিতে নির্জন নদীতে চলা ফেরা করে, তাহা হইলে মরিয়া হইয়া একটা চেষ্টা হযতো করিয়া বসিবে।

মণিমোহন কহিল, এবার তা হলে ফেরা যাক গোপীনাথ।

গোপীনাথের স্বরে নৈরাশ্য প্রকাশ পাইল, এত তাড়াতাড়ি ফিরবেন বাবু?

—দেরী করে আর কী লাভ? তশীল এর বেশি আর হবে বলে মনে কর নাকি?

—আজ্ঞে না, তা নয়—গোপীনাথ কথাটা স্বীকার করিয়াই ফেলিল, এই খাওয়া-দাওয়াটা আর কি। একরকম মন্দ তো চলছে না—পাঁঠা,

মুরগী, ডিম—বেশ পাওয়া যাচ্ছিল। আর কাছারীতে ফিরে গেলে সেই ভাগাভাগির কারবার, খেয়ে পেট ভরে না।

মণিমোহন হাসিয়া বলিল, খাওয়াটা তো আসল ব্যাপার নয়, চাকরী করতেই আসা।

—তা বটে। কিন্তু খাওয়াটা যুৎসই না হলে আর চাকরীর নামে এখানে কী আশায় পড়ে থাকি? আপনিই বলুন না।

মণিমোহন সহানুভূতি বোধ করিয়া কহিল, সে তো সত্যি। কিন্তু এতগুলো টাকা নিয়ে ঘুরে বেড়ানো—রাতে এসে যদি নৌকায় চড়াও হয়, তখন? একটা বন্দুক দিয়ে কী ঠেকানো যাবে?

গোপীনাথ সক্ষোভে বলিল, তা বটে।

কিন্তু কালুপাড়া হইতে বিদায় লইবার পূর্বে আর একটা ব্যাপার ঘটিয়া গেল।

সকাল বেলা বোটে বসিয়া মণিমোহন চা খাইতেছিল। যে কোনো অবস্থাতেই হোক, এই চা-টি না হইলে তাহার কোনোক্রমেই চলিবার জো নাই। মহিষের দুধ প্রচুর মেলে, যদিও চিনি পাইবার সম্ভাবনা নাই সব সময়ে। অভাবপক্ষে গুড়ের চা খাইবার অভ্যাসটা সে মোটা-মুটি আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। আজও সকালে গোপীনাথের তৈরী খেজুরের গুড়ের উগ্রগন্ধী চা গিলিতে গিলিতে সে দেখিল গ্রামের একটা বিরাট জনতা তাহার বোটের দিকে অগ্রসর হইতেছে। মজাঃফর মিঞার মেহেদী রাঙানো দাড়িটাই তাহাদের সকলের আগে চোখে পড়িল।

মণিমোহন বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কী ব্যাপার?

সম্মিলিত জনতার মধ্যে উত্তেজনা প্রকাশ পাইতেছিল। মেহেদী

রঙীন দাড়ি লইয়া মজাঃফর মিঞাই সম্মুখে অগ্রসর হইয়া তাহাদের বক্তব্য ঘোষণা করিল, আমরা বিচার চাই হুজুর।

—কিসের বিচার ?

তারপর কিছুক্ষণ ধরিয়া কলরব চলিতে লাগিল। তাহারা ক্ষেপিয়া গিয়াছে। হুজুর ভালোয় ভালোয় একটা বন্দোবস্ত করিয়া দিলে তো ল্যাঠা চুকিয়াই গেল, নতুবা যাহা করিবার তাহারা নিজেরাই করিবে। বহুকাল ধরিয়া তাহারা সহ্য করিয়াছে কিন্তু আর নয়।

—আঃ, ব্যাপারটা কী, তাই শুনি না।

আবার কলরব। তবে তাহার মধ্য দিয়াও বক্তব্যের মর্মটি উদ্ধার করা গেল। এই বর্মী মেয়ে। তাহাদের গ্রামে শান্তিপূর্ণ জীবনে সে ধূমকেতুর মতো আসিয়া দেখা দিয়াছে। গ্রামের জোয়ান ছোকরাগুলির মতিগতি বিগড়াইয়াছে। কাজ নাই, কর্ম নাই, তাহারা ওই মেয়েটার পিছনেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। শুধু কি তাই! তাহাদের নিজেদের মধ্যে হাতাহাতি এমন কি লাঠালাঠি পর্যন্ত হইয়া গেছে। সমস্ত গ্রামের বুকের মধ্যে ওই মেয়েটার রূপ প্রখর একটা অগ্নিপিণ্ডের মতো জ্বলিতেছে। আর শুধু যে জ্বলিতেছে তা নয়—সকলকে জ্বালাইতেছে সমান ভাবে।

শুনিয়া মণিমোহন স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার মনের মধ্যে প্রচণ্ড একটা আঘাত আসিয়া লাগিয়াছে। বর্মী মেয়েকে অবশ্য খুব চরিত্রবতী বলিয়া মনে করিবার মতো কোন কারণ কখনও ঘটে নাই। সেই ঝড়ের সন্ধ্যা কোনোদিন তাহার স্মৃতি হইতে মিলাইয়া যাইবে না—সেই অরণ্যমর্মরিত ভয়াল পরিবেশের মধ্যে, কালো অন্ধকারে বর্মী

মেয়ের সর্বাঙ্গ যেন মশালের মতো শিখায়িত হইয়া জ্বলিতেছিল। আগুনের কাজই দাহন—প্রতিদিন—প্রতি মুহূর্তেই নূতন করিয়া ইন্ধনের দাবী জানাইবে সে। মণিমোহন সেখানে একচ্ছত্র এবং অনন্য হইয়া থাকিবার প্রত্যাশা করিয়াছিল কেন?

তবুও তাহার মন মৃদু একটা বেদনার অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। বর্মী মেয়ের রক্তে উপনিবেশের বর্বর যৌবন জাগিয়াছে—সে যৌবন সর্বগ্রাসী; কিন্তু তাহাব মার্জিত দীপ্তি, তাহার চরিত্রে একটা রুচিসঙ্গত পরিচ্ছন্নতা—সবগুলি ভাবিয়া কথাটাকে যেন বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না।

নিজেকে আত্মস্থ করিয়া লইয়া সে প্রশ্ন কবিল, আমি এর কী বিচার করব?

মুখপাত্র মজাঃফর মিঞা কহিল, ডেকে এনে সম্মুখে দিন না হুজুর। নইলে আমরাই ওকে গাঁ থেকে তাড়িয়ে দেব। ওই কসবীটার জন্যে ছেলেগুলো সব জাহান্নামে গেল।

—তোমরা ওকে ডেকে নিয়ে এলে না কেন?

—ডেকেছিলাম হুজুর, এল না। ভারী মেজাজ। বলে কি জানেন? কোনো সরকারী বাবুকে আমি পরোয়া করি না। গরজ থাকে নিজেই যেন আসে।

কী হইল কে জানে, মণিমোহনের সরকারী পদমর্যাদাটা অকস্মাৎ অত্যন্ত প্রখর ও প্রবল হইয়া জাগিয়া উঠিল। এক মুহূর্তে তাহার মন অসহ্য ক্রোধ এবং অপমানবোধে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে শুরু করিয়া দিল।

—বটে! আচ্ছা যাও তোমরা—আমি দেখছি।

—ব্যবস্থা একটা করুন হুজুর, নইলে গাঁয়ে বাস করা কঠিন হবে আমাদের।

জনতা নিজেদের মধ্যেই উত্তেজিত আলোচনা করিতে করিতে বিদায় লইল।

তারা চলিয়া গেলে মণিমোহন খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। ওই মেয়েটা তাহাকে অপমান করিয়াছে, ঠকাইয়াছে তাহাকে। সেদিনকার সেই সন্ধ্যায় এত সহজেই তাহাকে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিল, সেই গর্বেই অভিভূত হইয়া আছে তাহার মন। কিন্তু এ গর্ব ভাঙিতে হইবে।

ঘণ্টাখানেক পরে দুজন পেয়াদা সে পাঠাইয়া দিল। মেয়েটাকে ডাকিয়া আনিতে হইবে।

পেয়াদারা ফিরিল দশ-পনেরো মিনিট পরেই। একরকম উর্ধ্বশ্বাসেই ছুটিতেছে তাহারা—তাহাদের সর্বাঙ্গ ঘর্মাক্ত। সমস্বরে কহিল, আসবে না হুজুর।

—আসবে না?

—না। শুধু কি তাই? মেয়েমানুষ নয় তো হুজুর, সাক্ষাৎ বাঘিনী। দা নিয়ে তাড়া করেছিল আমাদের, হাতের কাছে পেলে কেটে ফেল্‌ত।

বাঘিনী! তা বটে! একেবারে মিথ্যা নয়। প্রথম দিন যখন মা-ফুনের সঙ্গে তাহার দেখা হইয়াছিল, সেই দিনটার কথা মনে পড়িল। সেদিনও সে এমনি আসামী হইয়াই আসিয়াছিল। থান ইটের ঘায়ে স্বামীর মাথাটা দিয়াছে ফাটাইয়া—আর যাহারা তাহাকে ধরিয়া আনিয়াছে, তাহাদের আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিয়াছে। দুটি ক্রুদ্ধ চোখ জ্বলিতেছে তীব্র ক্রোধ আর হিংসার আলোকে।

বাঘিনী—তা বাঘিনীকে সায়েস্তা করিতেও সে জানে। মণিমোহনের

মনে হইল, তাহার সমস্ত পৌরুষ যেন একটা অসহ্য অপমানে মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়াছে। কী মনে করিয়াছে এই মেয়েটা? পশ্চিম বঙ্গের ছেলে—কিন্তু তাই বলিয়া সে কি এখনো পিছাইয়া নাকি? উপনিবেশ প্রবেশ করিয়াছে তাহার রক্তে—উপনিবেশ সঞ্চারিত হইয়াছে তাহার স্নায়ুতে। একান্ত ভাবে ইচ্ছা হইল, বন্দুকটা লইয়া সে নামিয়া পড়ে, একবার দেখিয়া আসে, বন্দুক অথবা দায়ের জোরটাই বেশি। বাঘের থাবার শক্তি যত প্রচণ্ডই হোক, তাহার নখ যতই ধারালো হোক, শিকারীর বন্দুক অথবা রাইফেলের মুখে চিরদিন তাহা গুঁড়াইয়া গেছে।

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত বসিয়া রাণীকে চিঠি লিখিল সে। কেমন করিয়া এবং কেন যে কে জানে, আজ রাণীকে চিঠি লিখিতে তাহার অত্যন্ত ভালো লাগিতেছিল। যেন একটা দুঃস্বপ্ন ভাঙিয়া সে রাতারাতি সুস্থ আর স্বস্থ হইয়া উঠিয়াছে। মণিমোহনের ভাবিয়া হাসি পাইতে লাগিল, সত্যি সত্যিই বর্মী মেয়েটা তাহাকে পাকে পাকে অজগর সাপের মতো গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে যেন। তাহার নীল চোখ—তাহার চুনির মতো রঙীন ঠোঁটের বিভঙ্গ—তাহার দেহের প্রতিটি অণু পরমাণুতে যৌবনের অসংকোচ আত্ম-প্রকাশ—সবটা মিলিয়া তাহাকে যেন প্রত্যেক দিন জীর্ণ করিয়া ফেলিতেছিল। আজ সে বাঁচিয়া উঠিয়াছে—ফিরিয়া পাইয়াছে নিজেকে। উপনিবেশ তাহার গৃহ নয়—এখানকার শ্রীহীন আদিম নির্লজ্জতার মধ্যে কোনোদিন সে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া নিতে পারিবে না। এই রাক্ষসী নদী, ঝড়ের মেঘে কালো হইয়া আসা বন্ধহীন আকাশ—এগুলি তাহার জীবনে সত্য নয়। প্রদীপের স্নিগ্ধ শিখায় ছোট ঘরটি আলোকিত—মণিমোহনের ফোটোখানির উপর এক ছড়া মালা দুলিতেছে। জানালার সামনে চুপ করিয়া বসিয়া আছে

রাণী। বাহির হইতে আমের মুকুলের গন্ধ আসিতেছে। হরিসভায় কীর্তন চলিতেছে—বাতাসে খোল করতালের সঙ্গে সঙ্গে গানের শব্দ। সেই জীবন অনেকদিন পরে আবার হাতছানি দিয়া মণিমোহনকে ডাকিল। নদী—কিন্তু নদী বলিলে কি এই! এখন—এই ফাল্গুন চৈত্রে সে নদী হাঁটিয়া পার হয় লোকে। দুই তীরে তার ভাট ফুল মদির গন্ধ বিস্তার করে, আর প্রেমদাস বৈরাগী বাবাজীর যে সমাধিটা ঝাউ বনের অন্ধকারে লুকাইয়া আছে, একটা প্রদীপ নদীর বাতাসে কাঁপিতে কাঁপিতে সেখানে আলো ছড়াইতে থাকে।

এই বহুদূর বিদেশের পরিপ্রেক্ষিতে বসিযা মণিমোহন আজ যেন নূতন করিয়া দেখিল তাহার গ্রামকে—নূতন করিয়া রাণীর কথা তাহার মনকে নাড়া দিতে লাগিল। বহুক্ষণ ধরিয়া সে চিঠি লিখিল। তারপর বাতি নিবাইয়া যখন সে ঘুমাইবার উপক্রম করিল, তখন নদী পর্যন্ত যেন রাত্রির তন্দ্রালু স্পর্শে নীরব হইয়া গেছে। দূরে কোথাও গাঙ-শালিকের বাসায় কিছু অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে, সম্ভবত রাত্রির সুযোগ লইযা ডাকাতের মতো সাপ আসিয়া হানা দিয়াছে তাহাদের গর্তে।

—বাবু, বাবু, সরকারী বাবু!

একটু তন্দ্রার আমেজ আসিয়াছিল, মুহূর্তে টুটিয়া গেল সেটা। ঘুমের ঘোরে ভুল শুনিল না তো? অথবা নিশির ডাক নয় তো? এ দেশে ভূত-প্রেত স্কন্ধকাটা কোনো কিছুতেই তো অবিশ্বাস করিবার নয়।

কিন্তু আবার স্পষ্ট ডাক আসিল—সরকারী বাবু!

বোটের মাঝিরা অসাড় হইয়া ঘুমাইতেছে। অস্বাভাবিক খাটে বলিয়াই অস্বাভাবিক ভাবে ঘুমায়। মড়া মনে করিয়া চিতায় তুলিয়া দিলেও তাহারা বোধ হয় জাগিবে না—ঘুমন্ত অবস্থাতেই স্বর্গলাভ করিবে।

সুতরাং এ ডাকে তাহারা জাগিল না। মণিমোহনের অজানিতে মাঝিদের সহযোগিতায় খানিকটা তাড়ি যোগাড় করিয়া গিলিয়াছে গোপীনাথ—অবশ্য টের পাইয়াও মণিমোহন কিছু বলে নাই। নেশা না টুটিয়া যাওয়া পর্যন্ত গোপীনাথ পড়িয়া থাকিবে জগদ্দল পাথরের মতো অচল ও অনড় হইয়া।

সুতরাং মণিমোহন নিজেই বাহির হইয়া আসিল। ভুল হইবার কোনো কারণ নাই। জলের ধারে কে একজন দাঁড়াইয়া আছে। তারার আলোয় সে সাহসিকাকে চিনিতে কষ্ট হইল না।

অসীম বিস্ময়ে মণিমোহন কহিল, তুমি এখানে? এই সময়ে?

অন্ধকারে সে হাসিল কি না বোঝা গেল না। বলিল, হাঁ আমি। একটুখানি আশ্রয় দিতে হবে সরকারী বাবু।

—আশ্রয়! বিস্ময়ে আর বাক্‌স্ফূর্তি হইল না তাহার।

জোয়ারের জলে বোটটা অনেকখানি ভাসিয়া আসিয়াছে। পরনের ঘাঘ্‌রাটাকে হাঁটু পর্যন্ত তুলিয়া অভিসারিণী ছপ্‌ ছপ্‌ শব্দে জল ভাঙিয়া একেবারে বোটের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। একটা হাত বাড়াইয়া বলিল, তুলে নাও আমাকে।

অবস্থাটা চিন্তা করিয়া মণিমোহন সংকুচিত হইয়া গেল-- এই বোটে? এখন?

—ভয় পাচ্ছ?

—না, ভয় নয়—মণিমোহন আর বলিতে পারিল না।

—বড় বিপদে পড়েই এসেছিলুম। তা হলে আমি ফিরে যাই—

—বিপদ! দ্বিধা কাটিয়া গেল মুহূর্তে। একথা ভুলিলে চলিবে না এই এলাকায় আপাতত সে রাজপ্রতিনিধি, অনেক কিছু করিবার ক্ষমতাই রাখে।

—না, না, এসো তুমি। হাত বাড়াইয়া সে তাহার লঘু দেহটি স্বচ্ছন্দে বোটে তুলিয়া লইল। তারপর বজরার মধ্যে আসিয়া দুজনে মুখোমুখি হইয়া বসিল—বসিল খানিকটা দূরত্ব রাখিয়াই। ঝড়ের রাত্রি আর আশ্রয়ের রাত্রি এক নয়। একটা সিগারেট ধরাইয়া মণিমোহন বলিল, কী বিপদ?

ক্লিষ্ট জবাব আসিল, পরে বলব।

দেশলাইয়ের কাঠির ক্ষণিক আলোকে মণিমোহন দেখিল নীলার উপর যেন মুক্তার বিন্দু টলমল করিতেছে। এই মেয়ের চোখেও কি জল দেখা দিতে পারে! নীরব বিস্ময় এবং বেদনার অনুভূতিতে তাহার মুখ দিয়া একটিও কথা বাহির হইল না, আর অনাহূতা দু হাতের মধ্যে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া রহিল একটা ছায়ামূর্তির মতো।

* * * *

চর ইস্‌মাইলের কাজ ফুরাইয়াছে। এখানে পড়িয়া থাকিলে আর কী হইবে? ওদিকে ব্যবসার যারা দু-একজন অংশীদার আছে তারা যে এই সুযোগে দুহাতে লুটিয়া খাইতেছে তাহাও নিঃসন্দেহ।

কিন্তু লিসি। গঞ্জালেস অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া দেখিল লিসিকে না হইলে তাহার চলিবে না। পৃথিবীতে যাহাকে পাইবার কোনো সম্ভাবনাই নাই, একমাত্র তাহারই জন্য সমস্ত অন্তরাত্মা আর্তনাদ করিতেছে গঞ্জালেসের। শরীরের দাবী মিটাইবার জন্য নারীর অভাব নাই, যতদিন অর্থ আছে ততদিন সে অভাব হইবেও না। তবু লিসিকেই তাহার একমাত্র প্রয়োজন। মোহ বেশিক্ষণ থাকিবার কথা নয়, লিসির প্রতি তাহার যেটুকু চিত্ত-চাঞ্চল্য জাগিয়াছিল, আজ বাদে কাল তাহার আন্দোলন অতি সহজেই যাইবে শান্ত এবং প্রশমিত হইয়া। কিন্তু আঘাত

লাগিয়াছে তাহার পর্তুগীজ অহমিকায়। তাহার সম্মুখ হইতে তাহারই স্বজাতীয়া বাঞ্ছিতাকে ছিনাইয়া লইয়া যাইবে কোথা হইতে একদল বর্বর রেঙ্গুনী আর আরাকানী আসিয়া!

গঞ্জালেসের প্রাক্-পুরুষেরা রচনা করিয়াছিল ইতিহাসকে আর আজ সেই ইতিহাসই নূতন করিয়া গঞ্জালেস্‌কে রচনা করিতেছে। পান্সী নৌকা নয়, যুদ্ধ জাহাজ। বাঘের জিভের মতো টকটকে লাল সাতটা পালে ঝড়ের হাওয়া লাগিয়াছে। নীল কেশর-ফোলানো সমুদ্রের ঘোড়ায় তাহারা আসোয়ার। সেদিন কোথায় ইংরাজ—কোথায় তাহার ম্যান্-অফ্-ওয়ার! সপ্তগ্রামের বন্দরে চলিতেছে আকাশ-ছোঁয়া অগ্নিযজ্ঞ—সরস্বতীর কালো জলে সেই আগুনের ছায়া নাচিতেছে। মৃতদেহে ভাগীরথীর বুক পরিকীর্ণ।

গঞ্জালেস্ ডি-সুজার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল।

কিন্তু ডি-সুজা তাহাকে চিনিল। শোকের এবং আকস্মিকতার ধাক্কাটা কিছু পরিমাণে সামলাইয়া সে আত্মস্থ হইয়া উঠিয়াছে বোধ করি। সমস্ত জীবন ধরিয়া একটা নির্মমতার ইতিহাস তাহাকে নির্মোকের মতো ঘিরিয়া আছে। শুধু নির্মোক নয়—চরিত্র এবং মনের উপর তাহা রচনা করিয়াছে লোহার মতো একটা দুর্ভেদ বর্ম। তাই এ আঘাতও সে সামলাইয়া লইল।

মাতালের মতো টলিতে টলিতে ডি-সুজা আগাইয়া আসিল সামনে। সম্বর্ধনা করিয়া বলিল, তুমি স্যামুয়েল!

—হাঁ, আমি স্যামুয়েল।

মমির হাতের মতো দুখানা কালো এবং শুকনা হাত বাড়াইয়া গঞ্জালেসের ডান হাতখানি টানিয়া লইল ডি-সুজা। তারপর যেন ঘুমন্ত

দুটি চোখ মেলিয়া স্বগতোক্তি করিল, ডেভিডের ছেলে তুমি। মানুষ খুন করাই ছিল ডেভিডের আনন্দ। তোমাকে এর শোধ নিতে হবে।

—হাঁ, এর শোধ নেব।—লোহার মতো দুটি কঠিন হাতে ডি-সুজার শিরা-বাহির করা জীর্ণ হাত দুখানি চাপিয়া ধরিল গঞ্জালেস্—এর শোধ আমি নেবই।

ডি-সুজার সমস্ত মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল।

—খুঁজে বার করতে হবে ওদের।

—হাঁ, খুঁজে বার করবই। চট্টগ্রাম থেকে আরাকান কদিনের পথ! তারপর বর্মা। তারপরে চীন। তারপরে পৃথিবী।

—ডি-সুজা চোখ বড় বড় করিয়া বলিল, সমস্ত পৃথিবী?

—সমস্ত পৃথিবী।

কতটুকু এই পৃথিবী! সমুদ্র যাহাদের পায়ের তলায়, মৃত্যুকে যাহারা লইয়াছে মুঠোর মধ্যে আয়ত্ত করিয়া—ঝড়ের গতির তালে তালে যাহাদের জাহাজ রাতারাতি মহাসাগর পার হইয়া যায়, তাহাদের কাছে পৃথিবী কয়দিনের পথ! কর্ণফুলীর তীরে নারিকেল-বীথির যে নীড়, তাহা তো পথের পাশে ক্ষণিকের ছায়া-শীতল আশ্রয় মাত্র। আকাশের আহ্বান আসিয়া সাড়া দিয়াছে—রক্তে রক্তে পাখা মেলিয়াছে যাযাবর পর্তুগীজের মন। কালো চামড়ার টুপি—বন্দুক—পায়ের তলায় শরণাগত পৃথিবীর ভয়ার্ত হৃৎপিণ্ড কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে।

ডি-সুজা কহিল, কিন্তু লিসি?

—তাকেও পাওয়া যাবে।

—পাওয়া যাবে?

আবার অকারণ খানিকটা নির্বোধের হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল ডি-সুজার মুখ।

পরের দিন সকালে ডি-সিল্‌ভার মনে হইল ডি-সুজার একটা সন্ধান লওয়া তার কর্তব্য। হাজার হোক প্রতিবেশী, দুঃসময়ে তাহার খোঁজ খবর না করাটা অত্যন্ত অমানুষিক ব্যাপার হইবে। যদিও লিলিকে বিবাহ করিবার প্রস্তাবটা লইয়া ডি-সুজা তাহাকে যা নয় তাই অপমান করিয়াছিল—কিন্তু এখন সেটা ভুলিয়া যাওয়াই উচিত। তা ছাড়া জননী মেরী তাহার দর্পের শোধ তুলিয়াছেন—ডি-সুজা উচিতমতো শিক্ষা পাইয়াছে। এখন আর পাপীকে ঘৃণা করা উচিত নয়।

অনেকটা করুণার্দ্র বোধ করিয়া ডি-সিল্‌ভা দেখা করিতে আসিল ডি-সুজার সঙ্গে। পায়ের মচকানোটা এখনো সারে নাই, খোঁড়াইয়া হাঁটিতে হয় এখনো। ব্যাঙের মতো লাফাইতে লাফাইতে একটা লাঠি ভর করিযা ডি-সিল্‌ভা আসিল। ডি-সুজাকে সান্ত্বনা দিতে হইবে।

কিন্তু কোথায় ডি-সুজা! বাড়িতে যে কখনো মানুষ বাস করিত, তাহারও তো চিহ্ন নাই কোনোখানে। শুধু কতকগুলি ভাঙা টুকরো টুকরো এলোমেলো জিনিস ছড়াইয়া আছে সমস্ত উঠানটাতে। মুরগীর খোঁয়াড়টা অবধি শূন্য—কতকগুলি পাখা আর আবর্জনাই সেখানে অবশিষ্ট! একটা ভাঙা ডিম খানিক নির্যাস লইয়া পড়িয়া আছে—দু-তিনটা কাক তাহা ঠোকরাইয়া ঠোকরাইয়া খাইতেছে। আর বাতাসে বেড়ার গায়ে ডি-সুজার একটা ছেঁড়া প্যাণ্টালুন নিশানের মতো দুলিয়া উঠিতেছে।

ধবক্ করিয়া ডি-সুজার বুকটা একটা ধাক্কা খাইল। এ সমস্ত কী ব্যাপার ?

লাঠি আর খোঁড়া পা একত্র করিয়া এক সঙ্গে আট-দশটা কোলা ব্যাঙের মতো লম্বা লাফ লাগাইল ডি-সিল্‌ভা। আসিয়া দর্শন দিল একেবারে নদীর ধারে।

গঞ্জালেসের নৌকাটা যেখানে বাঁধা ছিল সেখানে একটা নোঙরের মতো গর্ত এবং মোটা কাছির চিহ্ন ছাড়া আর কিছুই নাই। নদীতে যতদূর তাকানো যায় শূন্য একটা শুভ্রতা কেবল ধু ধু করিতেছে। গঞ্জালেসের নৌকার এতটুকু আভাস কোনোখানে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

ডি-সিল্‌ভা হাঁ করিয়া দিগন্তের পানে তাকাইয়া রহিল।

ইহার পরে চর ইস্‌মাইলে ডি-সুজা আর কখনো ফিরিয়া আসে নাই। এক দিন, দুই দিন, তিন দিন কাটিল—ডি-সিল্‌ভা এবং তাহার মতো আরো দু-চারজন উৎসাহী ব্যক্তি আসিয়া রাতারাতি ডি-সুজার ভিটে খুঁড়িতে লাগিয়া গেল। অনেক টাকা করিয়াছিল তো লোকটা—ভুলেও কি তাহার দু-একটা ঘড়া মাটির তলায় পুঁতিয়া রাখিয়া যায় নাই !

কিন্তু যাহা কিছু, পণ্ডশ্রম হইল মাত্র। মাঝে হইতে ডি-সুজার ভিটাগুলিতে কয়েকটা বড় বড় কুয়ার সৃষ্টি হইল, তাহার বেশি কিছুই নয়। তারপর নিরাশ হইয়া অর্থলোভীর দল ডি-সুজার ঘরের টিন, বাঁশ দরজা, কবাট যাহা পাইল তাহা লইয়াই প্রস্থান করিল।

পাশাপাশি দুইটি ভিটা—জোহান আর ডি-সুজার। তাহাদের সমস্ত অপ্রীতি আর সন্দেহের মাঝখানে লিসি সেতু রচনা করিয়া রাখিয়াছিল। একদিন সে সেতু ভাঙিয়া গেল। তারপর কালো

মৃত্যুর একটা আবরণ নামিল তাহাদের ঘিরিয়া—চর ইস্মাইলের পর্তুগীজ সংস্কৃতির উপর সময় ও শতাব্দীর নূতন হস্তাবলেপ।

৫

ওদিকে মণিমোহনের বোটের উপর রাত্রি শেষ হইয়া আসিল নক্ষত্র চক্রের গতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। কালো জলে ধূপছায়ার পাণ্ডুরতা। ঠাণ্ডা হাওয়ায় তেঁতুলিয়া কল্লোলিত হইয়া উঠিয়াছে। দূরে দূরে অরণ্য রেখার অর্থহীন জমাট রূপ এক একটা অবয়ব গ্রহণ করিতেছে ক্রমশ। নৈশ-পরিক্রমা শেষ করিয়া বাদুড়েরা ফিরিতেছে নিদ্রাতুর দেহ এবং মন লইয়া।

অর্থহীন চিন্তায় মণিমোহন এই দীর্ঘ সময়টা বসিয়া আছে অতন্দ্র চোখে। আর বর্মী মেয়ের মুখখানা তাহার হাতের মধ্যে লুকানো, ঘুমাইতেছে কিংবা জাগিয়া আছে বোঝা কঠিন। এত কাছে—অথচ এত দূরে! সেই ঝড়ের সন্ধ্যায় মনে হইয়াছিল সে বাঘিনী, সে বিষকন্যা। আর এখন মনে হইতেছে মাটির পুতুলের মতো ভঙ্গুর, স্পর্শমাত্রেই ভাঙিয়া লুটাইয়া পড়িবে মাটিতে। এমন অবসরে—এমন একটি সুন্দরী মেয়েকে কাছে পাওয়ার লোলুপতাটা করুণার বন্যায় কোথায় তলাইয়া গেছে।

তারপর মেয়েটি মাথা তুলিল। চুলগুলি চূড়া করিয়া বাঁধিতে বাঁধিতে কহিল, তোমার অনেক ক্ষতি করলুম।

মণিমোহন অস্পষ্ট গলায় বলিল, ক্ষতি?

—ক্ষতি ছাড়া আর কী। লোকে তো সত্যি মিথ্যে জানবে না, নিন্দে রটাবে তোমার।

—রটাক গে।

—নিন্দে-কলঙ্কের ভয় করো না তুমি ?

—করি বই কি। কিন্তু তার চাইতে অনেক বেশি দাম আমি পেয়েছি।

বর্মী মেয়ে ক্ষীণভাবে হাসিল। কথাটা সে বুঝিয়াছে। এই সভ্যতা-বর্জিত দেশের পটভূমিতে আজ আসিয়া সে দাঁড়াইয়াছে বটে; কিন্তু তাহার জীবন ও শিক্ষাদীক্ষা ঠিক এই ধাঁচের নয়। বিশিষ্ট বর্মীর মেয়ে সে, মৌলমিনে তাহার বাবার কাঠের কারবার ছিল। মিশনারী স্কুলে সামান্য কিছু লেখাপড়া করিয়াছিল, সভ্যতার উপরকার স্তরটাকেও যে কিছু কিছু না দেখিয়াছিল তা নয়। কিন্তু আশৈশব অসংযত তাহার মন। ঘোড়ায় চড়িয়াছে, সমানভাবে মারামারি করিয়াছে সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে। একদিন বাপ-মায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে শুধু ঝোঁকের মাথায় একটা ভ্যাগাবণ্ড্ যাযাবর লোককে সে বিবাহ করিয়া বসিল। তারপর—

তারপর নানা যোগাযোগে ঘুরিতে ঘুরিতে এই চর। অর্ধসভ্য মানুষগুলির সঙ্গে মেলা-মেশার দৈনন্দিন ফলে সে সকলের সঙ্গে এক হইয়া গেছে, এদের নীচতা আর অসংযমকে লইয়াছে সমান আয়ত্ত করিয়া। কিন্তু রেঙ্গুন-মান্দালয়—পেগু-মৌলমিন। প্রকৃতি-ধর্মের অতিরিক্ত সে মন, সে মন তাহার জাগিয়া উঠিল মণিমোহনকে কেন্দ্র করিয়া।

মণিমোহন তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিবার চেষ্টা করিল।

আবছায়া আলো পড়িতেছে বাহির হইতে। সে আলোয় তাহাকে চেনা যায় না—একটা আভাস পাওয়া যায় শুধু। করুণ আর শিথিল বসিবার ভঙ্গি। সমস্ত দেহটা ঘিরিয়া একটা স্নিগ্ধ মধুরতা যেন অস্পষ্টভাবে সঞ্চারিত হইয়া আছে। নীলার উগ্র রশ্মিটা নাই—যে আগুন প্রথম একটা অসহ্য জ্বালা লইয়া তাহার সামনে আসিয়া দেখা দিয়াছিল, সে আগুনই বা আজ কোথায়? একটা অর্থহীন বিষাদের প্রতিমূর্তি যেন।

মা-ফুন কহিল, এবার আমি নেমে যাব।

—নেমে যাবে?

—হাঁ, মাঝিরা জেগে ওঠবার আগেই। হয় তো তা হলে ব্যাপারটা চাপা থাকতে পারে এখনো। আসাটাই অবশ্য অন্যায় হয়েছিল, কিন্তু না এসে আমার কোনো উপায় ছিল না যে।

মণিমোহন জিজ্ঞাসু চোখে চাহিয়াই রহিল।

—না এসে উপায় ছিল না। তোমার কাছে মিথ্যে দরবার করেছে ওরা সব। আমি ওদের ছেলেপুলের মাথা খাবার কোনো মতলব করি নি, ওরাই বরং—

—বটে!—মণিমোহন উঠিয়া বসিল—আমার তখনই সন্দেহ হয়েছিল। এর একটা বিচার—

—কী লাভ? ওদের কোনো দোষ নেই। আমি একা—কেন ওরা সুযোগ নিতে চাইবে না? আজ রাতে ওরা সব দল বেঁধে আমার বাড়িতে হানা দেবার মতলব করেছিল, তাই তোমার কাছে এসে আশ্রয় নিয়েছিলুম। কিন্তু এবার আমি চললুম সরকারী বাবু—এর পরে বেলা উঠে যাবে।

—না, না, দাঁড়াও।—মণিমোহন উত্তেজিত হইয়া উঠিল—বেলা উঠুক,

কারো কথাতে আমি ভয় করি না। কিন্তু আজ বিকালে তো আমি চলে যাব, তারপর কোথায় আশ্রয় পাবে তুমি?

বর্মী মেয়ে কয়েক মুহূর্ত নীরব হইয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে জবাব দিল, সে ভাবনা আমার।

মণিমোহন আত্মবিস্মৃত হইয়া গেল মুহূর্তে। মা-ফুনের হাত দুখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইল সে। বলিল, তোমাকে আমি নিয়ে যাব।

—কোথায়?

—যেখানে হয়। তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না।

বর্মী মেয়ে শান্তকণ্ঠে বলিল, এসব কথার কোনো মানে নেই সরকারী বাবু। তোমার সমাজ আর জীবন আলাদা। কোনোখানে মিলবে না আমাদের। পথে যেতে যেতে যা পাওয়া যায় সেইটুকুই লাভ। কোথাও থেমে দাঁড়ালেই ঠকতে হয়।

আশ্চর্য পরিবেশ—আশ্চর্য জগৎ! ইহার মাঝখানে মণিমোহন এমনি একটি মেয়ের দেখা পাইবার কল্পনা কি স্বপ্নেও করিতে পারিত। অরণ্যের অন্ধকারে যেন অরণ্যলক্ষ্মী!

—এবার আমি চলি সরকারী বাবু। তুমি আমার বড় উপকার করেছ। তোমাকে আমি কখনো ভুলব না—মা ফুন্ উঠিয়া দাঁড়াইবার উপক্রম করিল।

কিন্তু মণিমোহন তাহাকে ছাড়িল না।

বলিল, আজ থেকে তুমি আমার।

শিশুর নির্বোধ সারল্যে মানুষ যেমনভাবে হাসে, ঠিক তেমন করিয়াই সে হাসিল। বলিল, কিন্তু স্বামী?

—সে তো তোমাকে ছেড়ে চলে গেছে।

—আবার ফিরতেও তো পারে।

—না ফিরবে না। মণিমোহনের কণ্ঠস্বর দৃঢ় শুনাইল—তুমি বাজে কথা বলছ আমাকে। আমি তোমাকে নিয়ে যাব কলকাতায়, সিভিল ম্যারেজের আইনে বিয়ে করব।

রাণী! পলকের জন্য মনের উপর দিয়া ভাসিয়া গেল রাণীর ছায়াছবি। বিদায়ের আগে তাহার অশ্রুম্লান মুখখানি। দূর বিদেশে কতদূর যে যাইতে হইবে। তাহার কাপালের সিন্দূর বিন্দুটি এবং হাতের শাঁখা যেন ঝল্‌মল্‌ করিয়া উঠিল একবার। তা ছাড়া এক স্ত্রী থাকিতে কি সিভিল-ম্যারেজ করা যায়? কিন্তু সে কথা পরে ভাবিলেও চলিবে।

এখানে বন্য-প্রকৃতির আদিম প্রেরণা। পাশে বসিয়া আছে বিদেশিনী বিচিত্র নারী—তাহার জ্বলন্ত তীব্র রূপ লইয়া। পৃথিবী এখানে পরিপূর্ণ কোমলতার নির্যাস বহিয়া অনাবৃত লাবণ্যে দাঁড়াইয়া আছে—বর্বর উচ্ছৃঙ্খলতার নেশা আপনা হইতেই আচ্ছন্ন করে আসিয়া।

বর্মী মেয়ে মৃদু ভাবে কহিল, তোমার আত্মীয়-স্বজন?

—কেউ বাধা দেবে না। তোমাকে আমি নিয়ে যাবই!

রাণী! কিন্তু রাণীর মুখখানা এবার সম্পূর্ণ করিয়া দেখা দিল না—ভাবনার পর্দার উপর ভালো করিয়া ফুটিয়া উঠিবার আগেই মিলাইয়া গেল ছায়ার মতো। মণিমোহনের দৃঢ় ও লোভী মুষ্টির মধ্যে বর্মী মেয়ের কঠিনে কোমলে মিশানো হাতখানি ঘামে ভিজিয়া উঠিতে লাগিল। হাতখানি ধীরে ছাড়াইয়া লইয়া বর্মী মেয়ে আরো দূরে সরিয়া বসিল।

বেলা বেশি হইবার আগেই মণিমোহন বোট ছাড়িয়া দিল।

মাঝিরা ভালোমন্দ কোনো কথা কহিল না—পরস্পরের দিকে একবার তাকাইল মাত্র। আর নেশা ছুটিয়া গেলেও গোপীনাথ চোখে মুখে খানিকটা জল দিয়া বসিয়া রহিল গুম্ হইয়া। এসব কী ব্যাপার ? চাকুরী করিতে আসিয়াছে—সন্ন্যাসী সাধু হইয়া নাই থাকিলে। কিন্তু তাই বলিয়া যে সে উপসর্গটাকেও কাঁধে করিয়া টানিয়া লইয়া যাইবে, কোন্ দেশি বেহায়াপনা এসব ? শিক্ষিত লোকগুলা কি একেবারেই নিরঙ্কুশ নাকি ?

তা ছাড়া হিন্দুর ছেলে। শরীরে খানিকটা বিশুদ্ধ আর্যশোণিত বহিতেছে সেটা তো আর অস্বীকার করিবার জো নাই বাপু। একটা নাপ্পিখাওয়া থ্যাবড়া-মুখো মগের মেয়েকে কাঁধে তুলিয়া শোভাযাত্রা করা—এ যে মুসলমানের ভাত খাওযার চাইতেও বিপজ্জনক। মুরগী না হয় চলিতে পারে, এক-আধটা নষ্ট মেয়েকে বোষ্টুমী রাখিলেও চলে, কিন্তু তাই বলিয়া একেবারে এতটা—

কী একটা বইতে গোপীনাথ পড়িয়াছিল সত্যযুগ আসিল বলিয়া। আর এই সত্যযুগে আবির্ভূত হইতেছেন স্বয়ং কল্কি অবতার, যত ম্লেচ্ছ এবং ম্লেচ্ছভাবাপন্নদের তলোয়ার দিয়া কচুগাছের মতো তিনি কচাকচ্ শব্দে সাবাড করিবেন। যাহারা বাঁচিয়া থাকিবে, তাহারা ঘুম ভাঙিয়া দেখিবে রাতারাতি তাহারা বাট হাত লম্বা হইয়া গিয়াছে—সত্যযুগের মানুষ কিনা। আর পৃথিবীতে অসাধু, চোর, পাওনাদার কিংবা চৌকীদারী ট্যাক্স কিছুই নাই—একেবারে রামরাজ্য যাহাকে বলে।

উৎসাহিত হইয়া গোপীনাথ কথাগুলি শুনাইয়াছিল মণিমোহনকে। কিন্তু মণিমোহন বিশ্বাস করে নাই—গাঁজা বলিয়া এবং নানারকম কটু-কাটব্য করিয়া জিনিসটাকে একেবারে উড়াইয়া দিয়াছে। সেই হইতে

গোপীনাথ মণিমোহনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পুরাপুরি নিরাশ হইয়া উঠিয়াছে। দু-দশটা অন্যায় কাজ কে না করে—পৃথিবীতে সবাই-ই আর এমন কিছু সাধুসন্ত জাতীয় জীব নয়, কিন্তু দু-চারটা মাস একটু শুদ্ধ-শান্ত থাকিয়া যদি কল্কি অবতারকে ফাঁকি দিয়া সত্যযুগের বাসিন্দা হইতে পারা যায় তো মন্দ কী। কিন্তু ও সম্বন্ধে মণিমোহনের কিছুমাত্র দুশ্চিন্তা বা চেষ্টা দেখা যাইতেছে না।

বোট চলিতে লাগিল। দিনের উজ্জ্বল আলো নামিয়া নদীর বুক হইতে অস্পষ্টতার শেষ আবরণ মিলাইয়া গেল। আবার সেই পুরাতন জল আর আকাশের জগৎ। মোহ নাই, আচ্ছন্নতা নাই—মৃত্যুর মতো নিঃসংকোচ ও নিরাবরণ। বোটের গায়ে জল বাজিবার শব্দ—মাঝে মাঝে কচুরি-পানার পচাগন্ধ। বিরাট নদীর তলায় নূতন মাটির সূচনা—মাঝে মাঝে মধ্য নদীতেও লগি বাধিয়া যাইতেছে!

উত্তেজনা খানিকটা শিথিল হইয়া আসিতেছে মণিমোহনের। উপনিবেশের স্বপ্ন-কোমল রহস্য-উপন্যাসের মতো রাত্রি, আর খাসমহল কাছারীর তহশিলদারের হিসাবের কাগজ-পত্রে আচ্ছন্ন দিন এক নয়। তা ছাড়া দিনের আলো বড় বেশি প্রকট, বড় বেশি উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেয়, কিছুই যেন প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিবার উপায় থাকে না। রাণীর ছায়ামূর্তি আবার আসিয়া উঁকি মারিতেছে।

বন্দী মেয়ে জড়োসড়ো হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। সমস্ত ঘটনাটাই যেন মন্ত্রবলে ঘটিয়া চলিয়াছে। মণিমোহনকে তাহার ভালো লাগিয়াছে সত্য—কিন্তু তাহার পশ্চাতে আছে উপনিবেশের এই পটভূমিকা। এই বর্বরতার মাঝখানে সে সভ্য-জগতের আলো লইয়া আসিয়াছে। কিন্তু সেই সভ্য-জগতেই? যেখানে মণিমোহন আর

দশজনের মধ্যে একজন, যেখানে বহুর মধ্যে বৈশিষ্ট্যহীন একটা বুদ্বুদ হইয়া মিলাইয়া যাইবে সে, সেখানে? নিজের বন্য মনকেই কি সে বিশ্বাস করে? রেঙ্গুন-মৌলমিন-পেগু হইতে নিজেকে সে একদিন ছিনাইয়া আনিয়াছিল—আজ আবার উপনিবেশকেও ছাড়াইয়া যাইতে চায়? নূতন জীবনেই কি বাঁধা পড়িবে সে? নদীর মতো সে বহিয়া আসিতেছে, পুরানো চর ভাঙিয়া নূতন চরকে সে রচনা করিতেছে প্রত্যহ—মণিমোহন কি অনড় হইয়া থাকিবে সেই স্রোতের মুখে? তাহার চাইতে—

সামান্য একটু হাসিয়া মা-ফুন্ বলিল, কেন মিথ্যে পাগলামি করছ সরকারীবাবু, আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে এসো। ঘর আছে, সংসার আছে তোমার। চরের জীবন চরেই শেষ হয়ে যাক, তার বাইরে তাকে টেনে নিতে চেয়ো না।

মণিমোহন বলিল, হুঁ।

অতি প্রত্যক্ষ দিনের আলো। প্রথম সূর্যের আলোয় নদীর মূর্তিটাকে শান্ত আর সুন্দর বলিয়া বোধ হইয়াছে। ভালো করিয়া তাকাইলে গাছ-পালার আভাসও সুদূর পরপার হইতে যেন হাতছানি দিয়া আহ্বান করে। সে আহ্বান এই রাক্ষসী নদীর মৃত্যু-সংকেত নয়—সে আহ্বান আসিতেছে সেখানকার বাণী লইয়া, যেখানে লাল-কাঁকরের প্ল্যাটফর্মের পাশে ছোট্ট একটি স্টেশন। কলিকাতার লোক্যাল্ আসিয়া মাত্র এক মিনিট দাঁড়ায়। কাঁচা মাটির পথের ধারে আমের বন ছায়া ফেলিয়াছে, আর—

বর্মী মেয়ে। রাত্রির একটি বিশেষ মুহূর্তে যে গরীয়সী, যাহার জন্য সে মুহূর্তে যত রকম অসাধ্য সব সাধন করিয়া ফেলা যাইতে পারে, দিনের বেলায় তাহার প্রয়োজন কতটুকু। লোলুপতার উপর নিশীথের রঙ

লাগিয়া তাহাকে দেহের অতীত ভাবের জগতে লইয়া যায়, কিন্তু সূর্যের আলো উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেয় তাহার অনাবরণ রূপ।

বর্মী মেয়ে আবার কহিল, ফিরে যাবার সময় আছে এখনো। আমার জন্যে তুমি ভেবো না। আমরা মগের মেয়ে—নিজেদের ভার নিজেরাই নিতে জানি। তুমি আমার জন্যে কেন যেচে নিন্দের বোঝা মাথায় নিতে চাচ্ছ? মণিমোহন জোর করিয়াই হাসিল অনেকটা। বলিল, পাগল! নিয়ে চলেছি যখন, নিয়ে যাবই। নিন্দের বোঝা মাথায় বইতে আমি ভয় করি না।

সত্যিই সে ভয় করে না। এই নদী, এই পৃথিবী, এই সব মানুষ। নিন্দা-প্রশংসা এখানে সমান অর্থহীন। কিন্তু সব কিছু তো এইখানেই শেষ হইবার নয়। পশ্চিম বঙ্গের ছেলে, পাকুড়-প্যাসেঞ্জার আর ধান-ক্ষেতের আওতায় বাড়িয়া উঠিয়াছে, বি-এস্-সি পাশ করিয়াছে; মার্জিত আর পরিচ্ছন্ন জীবনের স্বপ্ন তাহার সম্মুখে। এই পাণ্ডব-বর্জিত দেশে তো আর সে স্থায়ী ঘর বাঁধিতে পারিবে না। তাই এখান হইতে যখন তাহাকে ফিরিতে হইবে তাহার নিজের পরিচিত গণ্ডিতে—কলিকাতার ট্রামে-বাসে, সিনেমার আলোয় আর প্রসাধনের দীপ্তিতে উজ্জ্বল মুখগুলির মধ্যে—তখন? তখন? তখনও কি সে ভয় করিবে না?

মণিমোহন ভাবিতে লাগিল।

দুদিন পরে মণিমোহনের বোট আসিল চর ইস্‌মাইলে। কিন্তু বর্মী মেয়ে সঙ্গে আসে নাই। পথেই রাত্রে কোথায় কোন অবসরে যে বোট হইতে নামিয়া গেছে মণিমোহন জানিতেও পারে নাই সেটা। রাত্রির অন্ধকারে আশ্রয় নিতে আসিয়াছিল, রাত্রির অন্ধকারেই ফিরিয়া গেছে আবার। জল, জঙ্গল, অন্ধকার আর অরণ্য-প্রকৃতির আদিম বর্বরতা নিঃশেষে নিজের মধ্যে তাহাকে লুপ্ত করিয়া লইয়াছে।

কিন্তু সেটাই আশ্চর্যজনক ব্যাপার নয়। সব চাইতে বিস্ময়কর খবর এই যে মণিমোহন ফিরিয়া আর তাহাকে খুঁজিতে চায় নাই। এ মাসে তাহাকে দশহাজার টাকার কালেকৃশন দেখাইতে হইবে—বসিয়া থাকিলে চলিবে না। তারপরে হয় তো ছুটি মিলিতে পারে। রাণীর সঙ্গে কতদিন যে দেখা হয় নাই। নদীতে অবশ্য রোলিঙের ভয় আছে কিন্তু সেজন্য দেশের ছেলে কি দেশে ফিরিবার চেষ্টা করিবে না ?

প্রকৃতি আর মানুষ। প্রকৃতি মানুষকে জয় করিবার প্রত্যাশা লইয়া বসিয়া আছে—আশা করিতেছে, আবার সেই সৃষ্টির প্রথম দিনটির মতো তাহার সন্তানকে ফিরিয়া পাইবে নিজের বুকের ভিতর। কিন্তু কালের বেলাভূমিতে পদচিহ্ন আঁকিয়া আঁকিয়া যে যুগ হইতে যুগান্তরের পারে চলিয়া গেছে—সে আর কোনোদিন তাহার শৈশবে ফিরিয়া আসিবে না।

বলরাম ভাবিয়াছিলেন, মুক্তো এ যাত্রা তাঁহাকে খুনের দায়েই ফেলিল বুঝি। কিন্তু পরম আশ্বাসের সঙ্গে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি দেখিলেন, মুক্তো মরিল না। কিছুদিন বিছানায় পড়িয়া থাকিয়া সে নিজেকে সামলাইয়া লইল।

ব্যাপারটা বাহিরে কেউ জানিতে পারিল না, পারিবেই বা কে ? বলরাম দিনকয়েক নিজের যথাসাধ্য কবিরাজী বিদ্যা প্রয়োগ করিয়া মুক্তোকে চাঙ্গা করিয়া তুলিলেন। দুশ্চিন্তায় দুর্ভাবনায় এই সামান্য কয়দিনের মধ্যেই তিনি যেন অর্ধেক আয়ুক্ষয় করিয়া ফেলিয়াছেন—এমন জানিলে কি আর—

মুক্তো ভালো হইয়া উঠিল, কিন্তু অদ্ভুত পরিবর্তন হইয়া গেল তাহার ব্যবহারে। এতটুকু অভিযোগ সে জানাইল না বলরামের বিরুদ্ধে, যেন কিছুই হয় নাই, সমস্ত ব্যাপারটা অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক। অথবা জোর করিয়াই অতীতের ঘটনাটাকে মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়াছে সে। বলরাম অবশ্য এখনও তাহার কাছে আমল পাইতেছেন না, কিন্তু তাঁহাকে যে আজকাল সে অন্তত বাঘের মতো ভয় করিতেছে না, এইটুকু দেখিয়াই নিশ্চিন্ত হইলেন তিনি।

সন্ধ্যার দিকে বলরাম ভাবিলেন, একবার খাসমহল কাছারী হইতে ঘুরিয়া আসা যাক। যোগেশবাবু লোকটির দাবা খেলিবার সখ প্রচণ্ড। প্রথম প্রথম এখানে আসিয়া তিনি বলরামের আস্তানায় তাস খেলিয়াছেন; দাবার সঙ্গী ছিল না। তবে সম্প্রতি বলরামকেও দাবায় খানিকটা দীক্ষিত করিয়া লইয়াছেন—মাঝে মাঝে খাসমহল কাছারীতে গিয়া তিনি আসর জমাইয়া তোলেন।

বলরাম বাহির হইবার উপক্রম করিতে মুক্তো প্রশ্ন করিল, কোথায় যাচ্ছ?

—যোগেশবাবুর ওখানে।

—ফিরবে কখন?

—দেরী হবে!

বলরাম বাহির হইয়া গেলেন।

ফিরিলেন অনেক রাত করিয়া। দাবায় একবার জমিলে চট করিয়া উঠিয়া আসা কঠিন। তা ছাড়া খেলাটা এখনো শেষ হয় নাই। মাথার মধ্যে নৌকা, গজ আর মন্ত্রী সমানভাবে পরিক্রমণ করিতেছিল তাঁহার। কাল সকালেই আবার যাইতে হইবে। খেলা শেষ না হওয়া

পর্যন্ত শান্তি নাই মনে। পথে আসিতে আসিতে হিসাব করিতে লাগিলেন, ঘোড়ার আগে গজের কিস্তিটা লাগাইলে—

বাহিরের ঘরে আলো জ্বলিতেছে। রাধানাথ চুপটি করিয়া বসিয়া। বলরামকে ঢুকিতে দেখিয়া সে হুড়মুড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, সর্বনাশ হয়েছে বাবু!

বলরাম সভয়ে কহিলেন, কী সর্বনাশ?

—দিদিমণি চলে গেছে।

—চলে গেছে! চলে গেছে কি রে!—বলরামের মাথায় যেন গোটা আকাশটাই ভাঙিয়া পড়িল সশব্দে:

কোথায় চলে গেছে?

—গাজী সাহেব এসেছিল। তারই সঙ্গে।

শরীরে সমস্ত রক্ত উত্তেজনায় যেন শীতল হইয়া গেল বলরামের: ধরে নিয়ে গেছে! সশব্দে বোমার মত ফাটিয়া পড়িলেন তিনি—তোর চোখের সামনে থেকে মুসলমানে ধরে নিয়ে গেল তাকে? আর বসে বসে দেখলি তুই, বাধা দিতে পারলি নে? লাঠির ঘায়ে দু-একটা মাথা নামিয়ে দিতে পারলি নে মাটিতে? একটা খবরও দিলি নে আমাকে?

থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল বলরামের সর্বাঙ্গ।

কিন্তু ঘৃণা আর হতাশা প্রকট হইয়া উঠিল রাধানাথের কণ্ঠস্বরে।

—বাধা দেব কি বাবু? ইচ্ছে করেই তো চলে গেছে দিদিমণি। তোমাকে খবর দিতেও নিষেধ করলে। বললে, বাবুকে বলিস, আমি চলে গেলুম গাজী সাহেবের সঙ্গে। গলায় দড়ি! সকলের চোখের সামনে মুসলমানের সঙ্গে বেরিয়ে গেল—ছি—ছি—ছি—ছি!

বলরাম দারুমূর্তি বলরামের মতোই অনড় হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

রাধানাথ বলিয়া চলিল, ভয়ে তোমাকে বলি নি বাবু, দিদিমণি খুব খাতির জমিয়ে নিয়েছিল তোমার ওই গাজীর সঙ্গে। তুমি না থাকলেই গাজী যখন তখন যাতায়াত করত, আর—

বলরামের মুখের দিকে তাকাইয়া কথার মাঝখানেই রাধানাথ থামিয়া গেল।

দেওয়ালের গায়ে অসম্বৃত-বসনা চীনা নারীমূর্তিটি জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে অদ্ভুতভাবে। তাহার চোখে আচ্ছন্ন স্বপ্নাবেশ, তাহার মুখে লালসার মদির হাসি। কাচভাঙা ঘড়িটার বড় কাঁটাটা কেমন করিয়া যেন বাঁকিয়া সামনের দিকে উদ্যত হইয়া আছে, আর পেণ্ডুলামের নিয়ন্ত্রিত আন্দোলনের তালে তালে হাতুড়ি ঠোকার মতো অস্বাভাবিক শব্দ হইতেছে—ঠক্—ঠক্—ঠকাঠক্—

*　　*　　*　　*

পৃথিবী বাড়িতেছে।

নদীর মুখে প্রতিদিন নামিয়া আসিতেছে বাংলার বুক-ধোয়া পলিমাটি, দিগন্ত-প্রসারিত নদীর নিভৃত গর্ভকোষে মৃত্তিকার ভ্রূণ-শিশু লালিত হইয়া চলিয়াছে। জন্ম লইবে নূতন আলোয়, নূতন আকাশের নীল-নির্মল স্নেহচ্ছায়ায়।

শিশু পৃথিবী। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মতো বর্বরতা লইয়া—সেদিনকার মত উচ্ছল অসংযম লইয়া। নিজের খেলনা সে নিজেই চূর্ণ করিয়া চলিবে কয়েকদিন। সভ্যতা, সমাজ, ধর্ম—এগুলি এখনও তো তাহার দূর চক্রবালেই নিহিত।

কিন্তু চর পড়িতেছে নদীতে। গঙ্গার ব-দ্বীপের প্রাণ-প্রবাহিনী শিরা-উপশিরাগুলিতে মৃত্যুর মন্থরতা। সামুদ্রিক বহুভুজের মতো,

কালো কালো বাহু বাড়াইয়া দিতেছে নূতন সভ্যতা; কলে কারখানায় বন্দী বিদ্যুতের আর্তনাদ।

শাখায় পাতায় অন্ধকার করিয়া হিংসার গুহা এই যে সুন্দরবন, এ আর কতদিন দাঁড়াইবে কুঠারের মুখে! তেঁতুলিয়া কালাবদর কিংবা রামমঙ্গলের মুখে আর কি শরের জল তেমন পাহাড়ের মতো উঁচু হইয়া আসে? পর্তুগীজদের শেষ উপনিবেশ মিলাইয়া যায় নদীগর্ভে—সিবাস্টিয়ান্ গঞ্জালেসের রক্ত—ডি-সুজা, জোহান আর লিসি পর্যন্ত আসিয়াই থামিয়া গেছে। অবশিষ্ট আছে পেরিরা আর ডি-সিল্‌ভা, জমিতে লাঙল ঠেলে তাহারা, শুঁটকি মাছের ব্যবসা করে।

আরো দশবছর পরে যারা এখানে আসিবে, তারা দেখিবে কত বড় হইয়াছে চর ইস্‌মাইল। সভ্য, শিক্ষিত মানুষ। নদী—শান্ত এবং অহিংস, এখানে ওখানে চর পড়িয়া গোটা চেহারাই তাহার বদ্‌লাইয়া গেছে। আর, এস, এন, কোম্পানির নূতন লাইনে স্টিমার যাতায়াত করে, ফার্স্ট ক্লাশের ডেকে বসিয়া প্রেমালাপ জমায় আধুনিক তরুণ দম্পতী। শহর আর শিক্ষার প্রভাবে উপনিবেশ সমুজ্জ্বল। যদি সময় আসে তো সেদিনকার কাহিনী বলিব নূতন করিয়া।

কেবল আদিম পৃথিবীর সেই বর্বর দানবটারই মৃত্যু হইয়াছে। আর কালের বালুবেলার পরপারে প্রতিদিন মিলাইয়া আসিতেছে বিদ্রোহী শিশুদের অস্পষ্ট পদচিহ্নগুলি।

দ্বিতীয় পর্ব সমাপ্ত

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও শৈলেন প্রেস, ৪, সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা
হইতে শ্রীতীর্থপদ রাণা কর্ত্তৃক মুদ্রিত।